দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

নতুন বছরে
মোদী সরকারের সেরা উপহার
শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান
— পৃঃ ১১

হিন্দু শরণার্থীরা বুঝবেন
কে তাদের বন্ধু আর
কে শত্রু
— পৃঃ ২৩

৭২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯।। ৬ পৌষ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

# CAB

CITIZENSHIP AMENDMENT BILL - 2019

- আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান এবং পারসি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।
- ভারতীয় মুসলমানরা এই আইনে কোনো নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না।

# নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ৬ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৩ ডিসেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

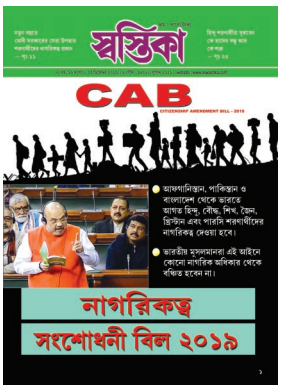






**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-** KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


ফ ঃ ১

# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**‘লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান’-এর স্বপ্ন চুরমার হতেই এত আগুন, এত অসন্তোষ** □ বিশ্বামিত্র □ ৬

**খোলা চিঠি : নো সংবিধান** □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

**এক ঐতিহাসিক ভুলেরই সংশোধনী এই নাগরিকত্ব বিল** □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৮

**নতুন বছরে মোদী সরকারের সেরা উপহার শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান** □ উর্মীশ্রী দেব □ ১১

**ভারতের রাজনীতিতে মূল্যবোধ কি অপস্রিয়মাণ?** □ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৩

**মাদ্রিদের শীর্ষ সম্মেলনে বিতর্কের ঝড়** □ প্রিয়দর্শিনী সিনহা □ ১৪

**শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পাবেন, অনুপ্রবেশকারীরা নয়** □ ভাস্কর ভট্টাচার্য □ ১৫

**নাগরিকত্ব আইনে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে** □ ১৬

**বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে এম এল এ, এম পি-রা চুপ ছিলেন কেন?** □ সিতাংশু গুহ □ ১৮

**হিন্দু শরণার্থীরা বুঝবেন, কে তাঁদের বন্ধু আর কে শত্রু** □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৩

**হিন্দু শরণার্থীকে আর শাসকদলের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে না** □ সুব্রত ভৌমিক □ ২৬

**ছেচল্লিশের কালো ছায়া আবার পশ্চিমবঙ্গে** □ মোহিত রায় □ ৩০

**সৌভাগ্য লক্ষ্মী মাস পৌষ** □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

**নিবেদিতার রচনায় মা সারদা** □ সুতপা বসাক ভড় □ ৩৩

**গল্প : বিবর্ণ গোধূলি** □ চিত্রলেখা দাশ □ ৩৫

**বিভূতিভূষণের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি** □ মালিনী চট্টোপাধ্যায় □ ৩৮

**নাগরিক সংশোধনী আইন : ভারতীয় সংবিধান ও আইনের প্রেক্ষাপট** □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ৪৩

**নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল শরণার্থীদের জন্য এক উজ্জ্বল প্রভাত** □ অমিত শাহ □ ৪৫

**নিয়মিত বিভাগ**

**উবাচ : ১০** □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **খেলা : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## মমতার জনগণনা বিরোধিতা

এন আর সি এবং নাগরিক সংশোধনী আইনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এন পি আর-এর বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে জনগণনা হোক তিনি চান না। বস্তুত, কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান অনুযায়ী জনগণনার বিরোধিতা করতে পারেন না। দেশের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য হাতে না থাকলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা অধোগতি পরিমাপ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিষয়টি যে সম্পূর্ণতই অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রবিরোধী সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রশ্ন হলো, মমতা কেন জনগণনার বিরোধিতা করছেন? এই বিষয়েই তিনটি বিশ্লেষণাত্মক রচনা প্রকাশিত হবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়।

**দাম : বারো টাকা মাত্র**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

**AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**


সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## মুখ্যমন্ত্রীকে জবাবদিহি করিতে হইবে

সংসদের দুই কক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ হইবার পর, তাহা রাষ্ট্রপতিও স্বাক্ষর করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা এখন আইনে পরিণত হইয়াছে। এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এখন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করিতে পারে। এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান হইতে আগত নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের এক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছে। ওই দেশগুলি হইতে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান শরণার্থীরা এইবার আশ্বস্ত হইবেন যে, ভারত রাষ্ট্র তাহাদের নাগরিকত্ব প্রদানে সম্মত হইয়াছে। শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের একটি দাবিও নাগরিকত্ব আইনে এই সংশোধনের মাধ্যমে পূরণ হইল। এবং ইহা সম্ভব হইল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হইয়া ভারতে আশ্রয় লওয়া এই শরণার্থীদের ব্যথা-বেদনা উপলব্ধি করিয়া যখন ভারত সরকার ইহাদের নাগরিকত্ব প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে, তখন তাহার বিরোধিতা করিতে ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি। তাহারা এই আইন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করিয়া বলিতেছে, এই আইনের ফলে মুসলমান সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে। অথচ, এই আইনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধান সম্মত সমস্ত অধিকারই এই আইনে সুরক্ষিত থাকিবে। তবু এই ধরনের মিথ্যা প্রচার করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার এবং মুসলমান সমাজকে উস্কাইয়া দিবার প্রয়াস চলিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি অর্থে বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই আইন তিনি পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করিতে দিবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। যখন সংসদে কোনো আইন পাশ হইয়া যায়, তখন প্রতিটি রাজ্য সরকার নিজ নিজ রাজ্যে সেই আইন কার্যকর করিতে বাধ্য। তদুপরি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধান সম্মতভাবে দেশের আইন মানিয়া চলিবার শপথ লইয়া মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। এখন তিনি যদি বলেন, আমি এই আইন পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করিতে দিব না—তাহা সংবিধান অমান্য করিবারই সমতুল্য হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরন্তর মিথ্যা প্রচার এবং উস্কানির ফলে গত কয়েকদিনে এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটিয়াছে। মৌলবাদী জেহাদিরা দিকে দিকে ভাঙচুর, লুটতরাজ করিতে পথে নামিয়া পড়িয়াছে। বাস-ট্রেন জ্বালাইয়া দিতেছে, রেল স্টেশন ভাঙচুর করিতেছে, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হইয়াছে। এমনকি রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা তাহারা লুট করিয়া নিয়া গিয়াছে। বহু জায়গায় হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রান্ত হইয়াছে, লুট হইয়াছে। হিন্দুদের দোকানগুলিও বাদ যায় নাই। এই অশান্তি রোধ করিতে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দাজনক। সর্বত্রই তাহারা প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে। কোথাওই এই অশান্তি দমন করিতে তাহাদের কঠোর ভূমিকা পালন করিতে দেখা যায় নাই। এই বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির দায় মুখ্যমন্ত্রী এড়াইয়া যাইতে পারেন না। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে তাহার ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার এবং উস্কানিমূলক মন্তব্য এই জেহাদি মৌলবাদীদের উৎসাহিত করিয়াছে। তাহারা যখন রাজ্যব্যাপী ধ্বংসলীলা চালাইয়াছে তখনও মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কঠোর হস্তে তাহা দমন করিবার নির্দেশ দেন নাই। আমাদের ১৯৪৬ সালের ঘটনাবলীর কথা মনে পড়িতেছে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে যখন উন্মত্ত মুসলিম লিগ সমর্থকরা কলিকাতার রাস্তায় অবাধে হিন্দু এবং শিখ পুরুষ রমণীকে হত্যা করিতেছিল, তখন অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী শাহিদ সোহরাবর্দি এইরকমই পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে পরিষ্কারভাবে জানাইতে হইবে, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি যাহারা অবাধে ধ্বংস করে, সেই দেশবিরোধীদের প্রতি তাহার এই নরম মনোভাব কেন? মুখ্যমন্ত্রীকে জানাইতে হইবে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান হইতে আগত নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালি হিন্দু, তাহাদের নাগরিকত্ব প্রদানের তিনি বিরোধী কিনা! আর বেশি দেরি নাই, যখন রাজ্যের মানুষই এই জবাবদিহি তলব করিবে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট।

## সুভাষিতম্

*শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।*

*ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধিঃ ন চ ধর্মো দয়াপরঃ।।*

*শান্তির সমান তপস্যা নেই, সন্তোষের চেয়ে সুখ নেই। লোভের চেয়ে বড়ো ব্যাধি নেই এবং দয়ার চেয়ে বড়ো কোনো ধর্ম নেই।*

# ‘লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান’-এর স্বপ্ন চুরমার হতেই এত আগুন, এত অসন্তোষ

**বিশ্বামিত্র-র কলম**

পাকিস্তান দাবি আদায়ের পর মুসলিম লিগের জনপ্রিয় স্লোগান ছিল ‘হাসকে হাসকে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান’। তা হিন্দুস্থান দখলের জন্য স্বাধীনতা-পরবর্তী বাহাত্তর বছরে ছল-বল-কৌশল নানাভাবে কার্যকরী করা হয়েছে। যার নিট ফল ‘পাক অধিকৃত কাশ্মীর’ নামে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য পাকিস্তানের দখলে, অরুণাচল-সিকিমে চীনের উৎপাত লেগেই আছে। ভারতের মাটিতে নির্বিচারে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। কাশ্মীরে সেনা-জওয়ান হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমান ভোট-লোলুপ রাজনৈতিক দলগুলির সৌজন্যে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দীর্ঘদিন বঞ্চনা। সবার ওপরে সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানি-বাংলাদেশি মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশ মোটামুটিভাবে ‘লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান’-এর মুসলিম লিগের অ্যাজেন্ডার সাফল্যের পথে কোনও বাধা ছিল না। মুসলিম লিগের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সেরকমভাবে নেই তো হয়েছে কী! তাদের সুদীর্ঘকালের দোসর কমিউনিস্টরা রয়েছে, নেহরুপন্থী কংগ্রেস আছে, আর মুসলমান-তুষ্টিকরণের গুণাগুণে দেশের যা রাজনৈতিক জল আবহওয়া তাতে মুলায়ম-মমতার মতো মুসলিম লিগপন্থী রাজনীতিবিদ জন্মাতেও বেশি সময় নেয় না। সর্বোপরি পাকপন্থী চীনের এদেশীয় রাজনৈতিক ভৃত্য হরেক প্রকারের মাওবাদী নকশালদের কথা তো না বললেই নয়, প্রভু পাকিস্তানের আজ্ঞা হলে ভারতে পরমাণু হামলা চালাতেও তারা চেষ্টার কসুর করবে না।

মুসলিম লিগ প্রকাশ্যে না থাকলেও তার পতাকাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার লোকের তাই অভাব ছিল না। ‘সেকুলার ভারত’-এর আড়ালে ইসলামিক উগ্রপন্থাকে আরও শান দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল, সন্ত্রাসবাদ জর্জরিত ভারতের ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে। তবে এই অ্যাজেন্ডায় এবার সর্বপ্রথম এত বড়োসড়ো আঘাত হানবার চেষ্টা করলো কোনও কেন্দ্রীয় সরকার। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ দিয়ে শুরু, আপাতত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নেওয়া। মাঝে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে দেশ-অস্মিতার প্রতীক রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে রায়, কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীকরণের প্রয়াস আসলে ‘সেকুলার ভারত’-এর মুখোশের আড়ালে আরেক পাকিস্তান তৈরির ছক বানচালের চেষ্টা। যার সর্বশেষ আঘাত এসেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করার মধ্যে দিয়ে।

একটু খেয়াল করলে দেখবেন, এই বিল, যা বর্তমানে আইনে পরিণত হয়েছে তাতে কোথাও মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা কিংবা মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়নের কথা বলা হয়নি। তা সত্ত্বেও রাস্তায় এত ফেজ টুপি লুঙ্গি পরিহিত জেহাদি সন্ত্রাসী আর তাদের দালাল লাল টুপি গুন্ডাবর্দির আবির্ভাব হলো কেন? যাদের হাতে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন বিনা কারণে, সোশ্যাল-মিডিয়া জুড়ে চলছে চূড়ান্ত অসভ্যতা, উস্কানি, জাতীয় সড়ক অবরোধ বাস, রেল পুড়িয়ে, টায়ার জ্বালিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে অসুস্থ মানুষকেও নাজেহাল -উদ্বিগ্ন করা— এগুলো কোন ধরনের প্রতিবাদের নিদর্শন? এই গুন্ডাদের প্রতি দেশদ্রোহী ‘বুদ্ধিজীবী’দের সহমর্মিতার শেষ নেই, ‘এ আর এমন কী ব্যাপার’ গোছের অঙ্গভঙ্গিতে তাঁরা মাঝে-মধ্যে বকুনি দিলেও সেটা লোক দেখানো সহজেই বোঝা যায়।

হিটলারি, ফ্যাসিবাদ এমনতরো নানাবিধ শব্দ ২০১৪-য় মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উড়ছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত কি পৃথিবীর আর কোথাও আছে যে দেশের সংসদে হামলাকারীর জন্মদিন সাড়ম্বরে দেশেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয়, দেশের বিরোধী দলের পারিবারিক সূত্রে সর্বোচ্চ নেতা শত্রুদেশের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ-বৈঠক করে? দেশের সেনা জওয়ান আক্রান্ত হলেও আক্রমণকারী শত্রু-দেশেরই গুণগানে মুখরিত হয়ে ওঠে দেশেরই কিছু সংবাদমাধ্যম? দেশের শাসক দলের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট একটি মতাদর্শ থেকে ক্রমাগত ঘৃণা ছেটানো হয়? জাতি-বিদ্বেষ, জাতি-দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয় স্বেচ্ছাকৃতভাবে? ‘টুকরে, টুকরে’, ও ‘আজাদি’র স্লোগান দিয়ে দেশভাগের ষড়যন্ত্র করা হয়? এমন ভূখণ্ড পৃথিবীর মানচিত্রে বিরল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রায়ে নির্বাচিত সরকারের ন্যূনতম বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করছে, মানুষের রায়ে প্রত্যাখ্যাত কিছু লোক এমন ইতিহাস বিরল।

তবে ভারতের সৌভাগ্য আমাদের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একজন দৃঢ়চেতা মানুষ যিনি বাঙ্গালি হিন্দুর পরিত্রাতাও বটে। তাঁর নেতৃত্বে ‘লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান’ আর ‘এ হিন্দুস্থান হামারা’ পাকপন্থীদের বাহাত্তর বছরের স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটেছে, তাই একটু জ্বলবেই, নিভতেও বেশি সময় লাগবে না। ■

# নো সংবিধান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার প্রশ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত সপ্তমে নিয়ে যেতে চাইছেন, তা আর নতুন করে বলার নেই। একের পর এক বয়ানে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, পষ্টাপষ্টি জানিয়েও দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব আইনের বাস্তবায়ন হবে না। এ ব্যাপারে এসপার ওসপারের জন্য প্রস্তুত তিনি ও তাঁর দল।

এই ধরুন গত সোমবারের কথা। সেদিন মিছিল শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ বক্তৃতা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর স্বভাবসুলভ ভাবে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্যাব চালু করতে গেলে তা আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে করতে হবে। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। তাঁর কথায়, ''কেন্দ্র চাইলে সরকার ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সরকার ফেলে দিলেও মাথা ঝোঁকাবো না। কোনও ভাবেই সারেন্ডার করব না''। মোদ্দা কথা তিনি সংবিধান মানবেন না। কেন, কী অত কথা নেই। মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক আগলে রাখতে হবে। সংবিধান আগলানোর দায়িত্ব তাঁর নয়।

মুখে অবশ্য তিনি শান্তির কথা বলছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন যাতে কোনও ভাবেই হিংসাত্মক না হয় সে ব্যাপারে বারবার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সব কিছুই করতে হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে। কোথাও ট্রেনে আগুন, পোস্ট অফিসে আগুন বা পথ অবরোধ যাতে না করা হয় তার জন্য বারবার আবেদন জানান মমতা। বলেন, রাষ্ট্রপতিকে লাখ লাখ চিঠি লেখা থেকে এক লক্ষ হাত মাপের কালো কাপড় তৈরি করে বিরোধিতা করতে হবে। কোনও আন্দোলনে যেন ধর্মের ভিত্তিতে না হয় সে বিষয়েও নজর রাখতে নির্দেশ দেন মমতা। এসব অবশ্য যখন তিনি বলছেন তার আগেই যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। তবে দিদি জানেন যে এসব তৃণমূল বা তৃণমূলের মুসলমান ভোটাররা করেননি। কিন্তু লোকে যে দেখে ফেলেছে!

দিদির সেই উত্তরও তৈরি। বলেই তো দিয়েছেন যে, তারই লোকেরা বিজেপির থেকে পয়সা নিয়ে ওসব করেছে। তিনি সবটাই জানেন। তখন কিছু বলেননি। যেমন ট্রেনে আগুন লাগানোর জন্য ট্রেন বাতিলের দোষটাও রেলের।

ওদিকে শঠেশাঠ্যং বিজেপিও। মমতা বলেছেন, ''আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে নতুন আইন কার্যকর করতে হবে।'' উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''নাগরিক সংশোধনী বিল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক রাষ্ট্রবিরোধী গতিবিধি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশি মুসলমানরা রাস্তায় নেমে যে ভাবে ব্যাপক হিংসা ছড়াচ্ছে এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে, এটা নজিরবিহীন। সব দেখেও হাতে হাত রেখে বসে রয়েছে রাজ্য সরকার। গুলি চালানো তো দূরের কথা, পুলিশ কোথাও লাঠিও চালাচ্ছে না। কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি এখনও। যে পুলিশ রাষ্ট্রবিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের কথা আমরা শুনব না। আমরা রাষ্ট্রের স্বার্থে মিছিল করব। দেশবিরোধীরা যদি আইন না মানে, তাহলে আমরাও আইন মানব না, এ আমি প্রকাশ্যে বলে রাখছি। কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজে আইন মানছেন না। সরকারি টাকায় প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর টিভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গে সিএবি হতে দেবেন না। যে আইন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে, রাষ্ট্রপতি যাতে সই করেছেন, সারা দেশে সেই আইন চালু হবে। পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে যে এখানে চালু হবে না? তিনি কী করে সংবিধান বিরোধী কথা বলছেন? উগ্রপন্থীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন তিনি।'' এর পরেই তিনি বলেন, ''আমার কর্মীদের উদ্দেশে আমার স্পষ্ট বার্তা, পুলিশের কথা শুনতে হবে না।''

আহা বেশ বেশ বেশ। দিদির সংবিধান না মানার স্বাধীনতা আছে কিন্তু তা বলে দিলীপ ঘোষ কী করে বলেন পুলিশ মানব না! বলি, এটা কি গাজোয়ারির জায়গা নাকি! ওদিকে আবার রাজ্যপাল মশাই একের পর এক বক্তব্য রেখে দিদির মাথাব্যথার কারণ তৈরি করছেন। আর তাতে এমন প্রশ্নও উঠছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক সংকট কি ক্রমশই অনিবার্য হয়ে উঠছে? সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় পরস্পরকে যে ভাষায় চিঠি লিখলেন, তারপর সেই আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বাঙ্গলায় যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে তা নিয়ে বিশদে জানতে সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিরেক্টরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু রাজ্যপালের সেই তলব তোয়াক্কা করেননি প্রশাসন ও পুলিশের এই দুই শীর্ষকর্তা। তাতে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে রাজভবনে তলব করে নবান্নে চিঠি পাঠান। এরপর রাজ্যপালকে কড়া ভাষায় জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই চিঠির পাল্টা উত্তর দেন রাজ্যপাল। এবং দুজনেই সেই চিঠি প্রকাশ করে দেন।

**—সুন্দর মৌলিক**

# এক ঐতিহাসিক ভুলেরই সংশোধনী নাগরিকত্ব বিল

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অনুমোদন সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে কমন পয়েন্ট কিছু ছিল না। বিলটি উভয়কক্ষেই স্বচ্ছন্দ গরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ হয়ে গেলেও বিতর্কের চরিত্র ছিল লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন।

একদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল-সহ অসমের পথে ঘাটে যে বিক্ষোভ চলছে তার বক্তব্য হচ্ছে যে বড়ো সংখ্যায় বাঙ্গলাদেশ থেকে আসা বিদেশি বাঙ্গালি হিন্দুদের সেখানে পাকাপাকি বসবাস করা নিয়ে। তারা সব ধরনের বিদেশিকেই অসম ছেড়ে চলে যাওয়ার দাবি জানাচ্ছে যারা ২৫/৩/৭১-এর বা তারও আগে সে রাজ্যে ঢুকেছে। অসমের বিক্ষোভকারীরা আদৌ চায় না যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, পার্সি বা জৈন যারা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের মধ্যে অসমে এসে বসবাস শুরু করেছে তাদের অনায়াসে নাগরিকত্ব প্রদান করে দেওয়া হোক। অর্থাৎ তারা অসমের স্থায়ী নাগরিক হয়ে উঠুক।

অন্যদিকে রয়েছে আরেক ধরনের বিরোধিতা যা সাধারণভাবে সংসদে এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় দৃশ্যমান। এদের বক্তব্য অনুযায়ী এই বিল বৈষম্যমূলক ও প্রবলভাবে মুসলমান বিরোধী। তাদের মতে বিলটিকে এইভাবে সরাসরি ধর্মীয় চরিত্র প্রদান করা একান্তভাবে সংবিধান

**নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এই মহাবিচ্যুতি ও অন্যায়েরই প্রতিকার। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হিন্দুরা ভারতে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অবস্থান নিয়ে বসবাস করতে পারবে। একটি ঐতিহাসিক ভুলেরই সংশোধনী হলো, অতীতে পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এঁদের অবস্থানে সমতা ফিরল।**

বিরোধী ও idea of India-র ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এঁরা নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে পাকিস্তানের নীতি ও ধর্মীয় দেশের ঘরনায় ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম বিরোধীদের বিরোধিতার সত্যটা বোঝা যায়। অসম ও ত্রিপুরা এই দু'টি রাজ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মোটেই জনসংখ্যার বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিরাট সংখ্যক বাঙ্গলাভাষী হিন্দু পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হওয়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে এই দুটি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এটা অবশ্যই সত্যি যে ঐ আগমনকারীদের একটা বড় অংশই অকথ্য ধর্মীয় নির্যাতনের কারণেই জান-মান বাঁচাতে এই রাজ্যে ঢুকেছে। কিন্তু এদের সঙ্গেই বহু মুসলমান ভারতের এই রাজ্যগুলিতে এসে অর্থনৈতিকভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছে।

এই যুগ্ম অভিবাসনের ফলশ্রুতিতে অসমীয় মাতৃভাষার অসমবাসীদের সংখ্যা তাদের রাজ্যেই ভয়ংকরভাবে তুলনামূলক কমে গেছে। তারা নিজ রাজ্যেই এই বিদেশি আগমনে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার সামাজিক পরিচয়টিই হারিয়ে যাবার মুখে পড়েছে। এর থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে হিন্দু শরণার্থী ও বৌদ্ধ চাকমাদের নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে সেখানে নিশ্চিত অসন্তোষ রয়েছে। অবশ্য এই দুটি সম্প্রদায়ের লোক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক সংহতি নষ্ট করার মতো বিপজ্জনক নয়। কিন্তু জনসংখ্যার ভারসাম্যের ও অসম রাজনীতির চরিত্রগত পরিবর্তন নিয়ে যে রাজ্যবাসীর উদ্বেগ তা যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করতে হবে। কেননা তারা নিজেদের মঙ্গলের দিকটিই হারিয়ে ফেলার চিন্তায় ভুগছে। সারা ভারতের অন্যান্য অংশে কিন্তু এই ধরনের আশঙ্কার কোনো পরিস্থিতি নেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ১৯৪৭ থকে ৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে রীতিমতে পরিকল্পনা করে অত্যাচারের মাধ্যমে দেশছাড়া করা হয়েছে। এগুলি বিভিন্ন মাধ্যমে নথিভুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে যেরকম রাতারাতি হিন্দু বিতাড়ন করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত দ্রুততায় ও একলপ্তে তা না হওয়ার বিষয়টা আনেকে খাটো করে দেখেন। প্রথম দিকে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে হয়তো পূর্ব পাকিস্তান একটি বহুধর্মীয় চরিত্র ধরে রাখতে পারবে।

আমাদের দেশের গণপরিষদে ১১ জুলাই ১৯৪৮ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়েছিল যখন নাগরিকরা ঠিক করে নিতে পারবে তারা পাকিস্তানে যাবে না ভারতে থাকবে। এর পরে পরেই ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে উভয়দেশই তাদের সংখ্যালঘু সমাজকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার অঙ্গীকার করে। এর ২১ বছর পরে ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ নামক দেশটির জন্ম হলো তখন এটা সহজেই বিশ্বাস করা গিয়েছিল যে এইবার অন্তত হিন্দু ও বৌদ্ধ সংখ্যালঘুরা নতুন দেশে শান্তি ও মর্যাদায় জীবন যাপন করতে পারবে।

এই চুক্তিতে আস্থাবানরা এটাও বিশ্বাস করেছিলেন যে, ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনার অত্যাচারে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তাদের একটা বড়ো অংশই

যুদ্ধ মিটতে সে দেশে ফিরে গেছেন। বাস্তবে এঁরা আদৌ ফিরে যাননি। বাঙ্গলাদেশ থেকে নিয়মকরে ভারতে ঢোকাও আদৌ বন্ধ হয়নি। এই সত্যটি বহু মহলে কানাঘুসোয় বা কখনো সোচ্চারে মেনে নেওয়া হলেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে এ বিষয়ে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টাই হয়নি। অবশ্যই নাগরিকত্ব সংশোধন বিল (CAB) এই দীর্ঘকালীন সমস্যাটিকে বৃহত্তর পটভূমিতে দেখার সুযোগ পায়নি, তবুও হিন্দু ও বৌদ্ধদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সুযোগ দিয়ে তারা যে চিরস্থায়ী ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে পাকাপাকিভাবে উদ্বাস্তুর অপমানজনক জীবন যাপন করছিল সেই যন্ত্রণা অন্তত কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই পলায়নকারীদের উদ্বাস্তু হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত, কখনই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নয়। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ থেকেই তাদের এই নির্যাতিত হয়ে ভারতে আসার বিষয়টিকে দেখেও না দেখার ভান করা হয়েছিল, যার ফলে তারা কোনো সামাজিক পরিচয় পায়নি। যেন কোনো আশাহীন অদৃশ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে মনুষ্যেতর জীবন যাপন করত। ভাবলে অবাক হতে হবে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই মানুষদেরই বহু পূর্বপুরুষ স্বাধীনতার লড়াইয়ে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। আর তাদেরই ধর্মীয় নির্যাতনকারীদের অনুকম্পার বস্তু হিসেবে জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি হয়েছিল ভারতের একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির ছলনাকে টিকিয়ে রাখার কারণে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এই মহাবিচ্যুতি ও অন্যায়েরই প্রতিকার। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হিন্দুরা ভারতে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অবস্থান নিয়ে বসবাস করতে পারবে। একটি ঐতিহাসিক ভুলেরই সংশোধনী হলো, অতীতে পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এঁদের অবস্থানে সমতা ফিরল।

একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের বেদনাদায়ক পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সমস্যা কিছুটা সুরাহা করার অর্থ কিন্তু এই নয় যে ভারত ওই তিনটি দেশের নীতিকেই অনুসরণ করছে। অর্থাৎ তারা যেমন ধর্মীয় দেশের অনুশাসন মেনে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের লোককেই গুরুত্ব দেয় বাকিরা অত্যাচারিত হয় এমনটা নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যে সমস্ত পাকিস্তানি রাজাকাররা এদেশে ঢুকেছিল, তাদেরও কেন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না এমন দাবি বাস্তবের সম্পূর্ণ বিচ্যুতি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অন্যায়। দু' ধরনের মানুষকে এই সূত্রে এক দৃষ্টিতে দেখা ঘোরতর অপরাধ। যাঁরা CAB নিয়ে এই ধরনের বিরোধিতায় নেমেছেন ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দু'টি জিনিসকে একই পঙক্তিতে বসিয়ে গুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার কাজই করছেন।

CAB গোটা সমস্যাটির একটি খণ্ডাংশের ওপর ব্যবস্থা নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করা সংক্রান্ত বিষয়টিই কেবল তার অন্তর্গত। কিন্তু যে সমস্ত লোক ভারতে ঢুকে বসবাস করছে অথচ বোঝা যাচ্ছে তারা নিশ্চিতভাবে অবৈধ নাগরিক সেই সমস্যার দিকে নজর দেওয়া এখনও বাকি। এই বিলের মাধ্যমে একটি নাগরিক সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সকলেরই সেই বিষয়টিকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে বোঝা উচিত। ভারতমাতার কাছে আশ্রয়পার্থী ও নিরাপত্তা ভিক্ষুদের দেশ যে ফেরায়নি এই বিল তারই প্রমাণ। ■


*With Best Compliments from :*

**BORBHETA ESTATE PRIVATE LIMITED**

***Producer of Quality Assam Orthodox & CTC Teas***

**MADHUBAN T.E.**

**MAYAJAN T. E.**

**NILIMA T. E.**

**MANOJKUNJ T. E.**

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019

Phone : 2475 6524, 2475 7760, Fax : 2475 7619

E-mail : madhubanrecp@hotmail.co.in

## রম্যরচনা

# ট্যাক্সিওয়ালা ও তিন মাতাল

তিন মাতাল একটি ট্যাক্সিতে উঠেছে। ট্যাক্সিওয়ালা বুঝেছে তারা মাতাল। বুঝেই তাদের ঠকাবার তাল করেছে। তিন মাতাল ট্যাক্সিতে উঠে বসার পর ট্যাক্সিওয়ালা কোথাও না গিয়ে, গাড়িতে কিছুক্ষণ স্টার্ট দিয়ে রেখে পরে বন্ধ করে বলল— বাবু আপনাদের জায়গা এসে গেছে, এবার নামুন।

প্রথম মাতাল নেমে যাবার সময় ট্যাক্সিওয়ালার হাতে একশো টাকা গুঁজে দিয়ে বলল— ভাই, এত ভালো গাড়ি চালালে, এটা তোমার বকশিস।

দ্বিতীয় মাতাল ট্যাক্সি থেকে নামার আগে ট্যাক্সিওয়ালার হাতে পঞ্চাশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল— ভাই, এত রাতে যে তুমি পৌঁছে দিলে আমাদের তার জন্য এটা বখশিস।

কিন্তু তৃতীয় মাতাল নামার সময় একটা চড় কষালো ট্যাক্সিওয়ালার গালে। ট্যাক্সিওয়ালা ভাবল এ বোধহয় বুঝে গেছে যে, ঠকানো হয়েছে। ট্যাক্সিওয়ালা কাচুমাচু মুখে বলল— আমি কী করলাম স্যার? তৃতীয় মাতাল বলল— তুই কেন বলিসনি ট্যাক্সিতে আমার বউকেও তুলেছিস?

## উবাচ

“কেন সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে? বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে! যারা এসব অশান্তি করছেন, তারা আগে এসব বন্ধ করুন।”

**এস এ বোবদে**
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

*বিক্ষোভকারীদের আইনজীবীকে*

“আপনি বাংলাদেশিদের পক্ষে। লক্ষ্য করলাম, আপনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে হিন্দি ও উর্দু ভাষার ব্যবহার করছিলেন। পূর্ববঙ্গের শরণার্থী বাঙ্গালিরা কতটা উর্দু বোঝেন জানি না। উর্দুতে কাদের বার্তা দিচ্ছিলেন?”

**দিলীপ ঘোষ**
রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ

*দলীয় কর্মীদের সভায় মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশে*

“রাজ্যের তরফে একটিও এফ আই আর হয়নি। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এতে প্রমাণ হয় মুখ্যমন্ত্রী সংকীর্ণ রাজনীতি করতে গিয়ে আগুন নিয়ে খেলছেন।”

**রথীন্দ্র বসু**
রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক

*ক্যাব বিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে*

“প্রতিটি ভারতবাসীর স্বপ্ন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ। বহু বছর আগেই মন্দির নির্মাণ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস চায়নি মন্দির নির্মাণ হোক। এখন আগামী চার মাসের মধ্যেই মন্দির নির্মাণ শুরু হয়ে যাবে।”

**অমিত শাহ**
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

*ঝাড়খণ্ডে এক নির্বাচনী সভায়*

# নতুন বছরে মোদী সরকারের সেরা উপহার শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান

**উর্মীশ্রী দেব**

দেখতে দেখতে মাস পেরিয়ে গিয়ে বছর শেষের দিকে এগোতে শুরু করেছে। আর সেই মুহূর্তেই লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে গেল ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী বিল। ভোটাভুটিতে ১২৫টি ভোট পড়েছে বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে পড়েছে ১০৫টি ভোট। এর পর কেন্দ্রীয় সরকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় রুলস ও প্রক্রিয়া তৈরি করবে এবং গ্যাজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা প্রকাশ হওয়ার পর সমগ্র দেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা এই আইনের সুফল পাবেন। এই রুলস বা প্রক্রিয়া তৈরির ক্ষমতা ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রের সরকারের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

সংশোধনী বিলটি সংসদের উচ্চকক্ষে পাশ হওয়ার পর দেশের প্রধানমন্ত্রী দিনটিকে 'যুগান্তকারী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী দিনটিকে ভারতীয় সংবিধানের কলঙ্কিত দিন বলেছেন। সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাই এখন দেখে নেওয়া যাক আইনটি কতটা সংবিধানসম্মত। দেশ শাসন করার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করে সেই দেশের সংবিধান। সাধারণত জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনও সংস্থা একটি সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। ভারতের সংবিধান বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য এই ধরনের নির্বাচিত সংস্থাকে গণপরিষদ বলা হয়। ভারতের সংবিধান হচ্ছে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান কার্যকরী হয় দেশে। গণপরিষদে সংবিধান গ্রহণ করেই নাগরিকত্ব নিয়ে ৫ থেকে ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ বলবৎ করা হয়। তার আগে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেসময় ইংরেজ শাসিত ভারতে যারা বাস করতেন তাদের ব্রিটিশ প্রজা মনে করা হতো এবং ব্রিটিশ আইন মোতাবেক তাদের শাসন করা হতো। আমরা সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকত্বের কথা পাই। আমরা যদি সংবিধানের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাওয়া যাবে এই অনুচ্ছেদটি খসড়া সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের সঙ্গেই ছিল। সর্বমোট ৩৮ দিন গণপরিষদে মৌলিক অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকর এই অংশকেই 'সবচেয়ে সমালোচিত অংশ' বলেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ২৯ এপ্রিল যখন গণপরিষদে মৌলিক অধিকারের উপর অগ্রিম রিপোর্ট পেশ করা হয় তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্পষ্ট বলেছিলেন : 'It is important to remember that the provision about Citizenship will be scrutinized all over the World. They are watching what we are doing. পরে গণপরিষদের সভায় সেটা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে সরিয়ে সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়। অর্থাৎ নাগরিকত্ব আমাদের কারোর মৌলিক অধিকার নয়। নাগরিকত্বের অধিকারটি একটি বিশেষ সুবিধার (Special Privilege) পর্যায়ে পড়ে। মনে হয় নাগরিকত্বের ব্যাপারটি নিয়ে গণপরিষদে এতই আলোচনা বা বিতর্ক হয়েছিল সেজন্য তার কোনো ইতি টানতে না পেরেই সংসদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় আইন তৈরির জন্য। তাই গণপরিষদের ১৯৪৯ সালের ১০ আগস্টের বিতর্ক সভায় সংবিধান সভার চেয়ারম্যান বি. আর. আম্বেদকর বলেছিলেন— '...it is not possible to cover every kind of case for a limited purpose, namely, the purpose of conferring citizenship on the date of commencement of the Constitution. If there is any category of people who are left out by the provisions contained in this amendment, we have given power to Parliament subsequently to make provision for them." সংবিধানের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দেশের নাগরিকত্ব লাভ ও নাগরিকত্বের অবসান নিয়ে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করার জন্য। ওই

**নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে যে ধর্মীয় বিভাজন রয়েছে সেটা আইনসঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত। সেই সঙ্গে রয়েছে মানবিকতা এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতি। এটা কোনোভাবেই সংবিধান বিরোধী নয়।**

অনুচ্ছেদের শিরোনাম হলো : "Parliament to regulate the right of citizenship by law". আর সেই ক্ষমতা অনুসারেই সংসদে ১৯৫৫ সালের ৩০ ডিসেম্বরে পাশ হয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫। এছাড়া সংবিধানের ২৪৬ (১) নম্বর অনুচ্ছেদেও স্পষ্ট বলা হয়েছে :

"...Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule."

এই সপ্তম তফশিলে মোট ৯৭টি আইটেম রয়েছে আর তার মধ্যে ১৭ নম্বর আইটেমে রয়েছে নাগরিকত্ব, দেশীয়করণ ও বিদেশি সংক্রান্ত বিষয়। এক কথায় বলা যায় নাগরিকত্ব বিষয়টি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত এবং সংসদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এই বিষয়ে যথাযথ আইন প্রণয়নের। রাজ্যসভায় আলোচনার সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের তাবড় তাবড় আইনজীবীরা প্রশ্ন তোলেন মুসলমানদের এই বিলে কেন রাখা হয়নি। অমুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য বিলে যে ধর্মীয় শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে তা আইনসঙ্গত নয়। এদের স্লোগান হচ্ছে— 'ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব বিল মানব না'। এদের এক প্রকার মুখপাত্র হয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশ এবং বুদ্ধিজীবীরা বলছেন এই বিল সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা করেছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তরে সংসদে জানিয়েছেন— বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই তিনটিই ইসলামিক দেশ। তাই সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মীয় নির্যাতনের সম্ভাবনা কম। ফলে এই সংশোধনী বিলে তাদের কথা রাখা হয়নি। তবে কোনও মুসলমানের সঙ্গে অবিচার হলে, তাঁকেও ভিসা দেওয়া হয়েছে (উদাহরণ তসলিমা নাসরিন আদনান সামি প্রমুখ)। সঙ্গে তিনি একথাও জানান গোটা পৃথিবী থেকে যদি মুসলমানরা এসে এদেশের নাগরিকত্ব চান, তাহলে তা দেওয়া সম্ভব নয়। এভাবে দেশ চলতে পারে না। তার জন্য আইন তৈরি হয়েছে।

সকলের জানা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে সাম্যের অধিকার (Right to Equality) এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্ম, জন্মস্থান, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না (Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth)। উল্লেখ্য, সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে। ওই অনুচ্ছেদের বলে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, পারসি, শিখ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক দেশীয়করণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অতএব, ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ যতদিন পর্যন্ত ওইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন না ততদিন পর্যন্ত প্রযোজ্য বা লঙ্ঘন হবে না।

এখন সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া যাক। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'The State shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India'. এই অনুচ্ছেদ ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা নাগরিকের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সমান প্রযোজ্য ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা প্রতিটি মানুষের ওপর অর্থাৎ দেশি-বিদেশি সবার ক্ষেত্রে। ওই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' (equality before law) এবং 'সবাই আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' (eaual protection of the law)—এই দুটি ধারণার অনুপ্রেরণা আমাদের সংবিধান প্রণেতারা লাভ করেছিলেন আয়ারল্যান্ড ও আমেরিকার সংবিধান থেকে। দুর্গা দাশ বসুর লেখা সংবিধানের বইয়ে equal protection বলতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'all individuals and classes will be equally subjected to the ordinary law of the land administered by the law courts'। কিন্তু ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনটি একটি বিশেষ আইন।

আর সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ইতিমধ্যে বেশ কিছু মামলার রায় প্রদান করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রায়টি ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৫২ সালের ১১ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম আনোয়ার আলি সরকার মামলায়। বলা বাহুল্য ওই রায়টি আজও বহাল রয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন মুখ্যবিচারপতি এম. পতাঞ্জলি শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ওই রায় প্রদান করে। ওই রায় অনুসারে ন্যায়সঙ্গত শ্রেণীকরণ করা যায়। পিছনে থাকতে হবে ন্যায়সঙ্গত কারণ। অবশ্য শ্রেণীভিত্তিক আইন তৈরি করা যাবে না। ওই রায়ে মুখ্যবিচারপতি স্পষ্ট বলেছেন : '— Article 14 of the Constitution does not mean that all laws must be general in character and universal in application. The State must possess the power of distinguishing and classifying persons or things to be subjected to particular laws and in making a classification the legislation.' ওই মামলায় সুপ্রিমকোর্ট আরও বলেছে যে, Just cause for discrimination is permissible on the basis of a real and substantial distinction relating to the objects sought to be achieved. ২০০৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কারাগারে বন্দি এক ব্যক্তি মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেছিলেন, কারাগারে বন্দিদের দুটি ভাগে ভাগ করা একটি বৈষম্যমূলক আচরণ। অর্থাৎ তখন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকার মহিলাদের বিরুদ্ধে করা অপরাধের বন্দি এবং অন্যান্য অপরাধের বন্দিদের মধ্যে বিভাজন করেছিল। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট বলেছিল, 'this is reasonable classification to achieve some objective.' এছাড়াও সেদিন রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ ভূপেন্দ্র যাদবের মুখে উচ্চারিত হয়েছে ১৯৫৫ সালের হ্যানস মুলার মামলার কথা। এইটুকু আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রকৃত বা উপযুক্ত বাস্তবসম্মত পার্থক্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য আইনে বৈষম্য বা শ্রেণীবিভাজন করা যায়।

সবশেষে বলা যায়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে যে ধর্মীয় বিভাজন রয়েছে সেটা আইনসঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত। সেই সঙ্গে রয়েছে মানবিকতা এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতি। এটা কোনোভাবেই সংবিধান বিরোধী নয়। নাগরিকত্ব লাভ কীভাবে সহজ থেকে সহজতর হবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের রুলস ও প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে খেয়াল রাখতে হবে অসমের এন আর সি নবায়নের মামলা এখনো সুপ্রিমকোর্টের বিচারাধীন। সামনেই ইংরেজির নতুন বছর ২০২০। নতুন বছর মানেই নতুন কিছু আশা, নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা। নতুন কিছু পাওয়ার আশায় প্রত্যেকের পথ চলা শুরু হয়। তাই সমগ্র ভারতের উদ্বাস্তুদের পথ চলা ইংরেজির নতুন বছরে শুরু হোক পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে। ■

# ভারতের রাজনীতিতে মূল্যবোধ কি অপস্রিয়মাণ?

**ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়**

রাজনৈতিক নেতাদের সাম্প্রতিক কার্যাবলী একটি দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, সেটি হলো সবকিছুর ঊর্ধ্বে ব্যক্তিস্বার্থ অথবা দলের স্বার্থ। এর ফলে দেশ পিছনের সারিতে চলে গেছে।

গত ২৪ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় অথচ সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিজেপি-শিবসেনা জুটি সম্পূর্ণ বহুমত লাভ করা সত্ত্বেও এক অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। শিবসেনার নেতা উদ্ধব ঠাকরে তাঁর পুত্র আদিত্য ঠাকরেকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে বলে দাবি জানান। পুত্রমোহে অন্ধ উদ্ধব ঠাকরে সমস্ত মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে এক অন্যায্য দাবি আঁকড়ে থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে তিন দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করতে একটু দ্বিধা করলেন না।

মহারাষ্ট্রের জনগণ দেখে যেতে থাকল রাজনীতির নেতাদের ক্ষমতার লোভ কোন পর্যায়ে যেতে পারে। নির্বাচনে চতুর্থ স্থান পাওয়া কংগ্রেসের ভাগ্যে কীভাবে শিকে ছিঁড়ল। বিজেপি-শিবসেনার নির্বাচনী প্রচারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশকেই সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রজেক্ট করা হয়। শিবসেনার তরফ থেকে তখন কিন্তু কোনও আপত্তি জানানো হয়নি। দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়েও কোনও সমস্যা হয়নি। বিজেপি যেখানে প্রার্থী দিয়েছে, শিবসেনা সেখানে প্রার্থী দেয়নি। অপরদিকে শিবসেনা যেখানে প্রার্থী দিয়েছে, বিজেপি সেখানে দেয়নি। আসন-সমঝোতা নিয়ে দুই দলের মধ্যে নিশ্চিত বোঝাপড়া তাদের নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। প্রত্যাশিত ভাবেই জনগণ সব থেকে বেশি ভোট দিয়েছে বিজেপি- শিবসেনা জোটকেই। অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস, শিবসেনা জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোনও গুরুত্বই দিল না। দীর্ঘদিনের সঙ্গী বিজেপিকে ছেড়ে এনসিপি ও কংগ্রেসের পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ল।

এদিকে শরদ পাওয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র অজিত পাওয়ার লিখিত ভাবে বিজেপিকে সমর্থন জানালো নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে। এনসিপি দলের এই অজিত পাওয়ার দুর্নীতির

দায়ে অভিযুক্ত একজন নেতা যার সেচ কেলেঙ্কারি নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। সেই দুর্নীতিগ্রস্ত অজিত পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দেবেন্দ্র ফড়নবীশ মুখ্যমন্ত্রীর গদি দখল করলেন।

এবার সুপ্রিম কোর্ট জানাল যে বিধানসভায় ফড়নবীশকে 'ফ্লোর টেস্ট' দিতে হবে তাঁর সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য। এটা সংবিধানেরই ফরমান, নতুন কিছু নয়। এবার সুযোগ বুঝে অজিত পাওয়ার সুড় সুড় করে আবার এনসিপি অর্থাৎ শরদ পাওয়ারের চরণাশ্রিত হয়ে গেল। আড়াল থেকে খেলাটা সম্ভবত শরদ পাওয়ারই খেলছিলেন, বিজেপি বুঝতে পারেনি। অনেকে বলছে যে বিজেপির চাণক্য যাকে বলা হয় সেই অমিত শাহ আরও বড়ো চাণক্য শরদ পাওয়ারের কৌশলের কাছে পরাজিত হলেন।

এদিকে উদ্ধব ঠাকরে তাঁর হিন্দুত্বের আদর্শ ভুলে গিয়ে বলা যায় জলাঞ্জলি দিয়ে, চিরকাল যে দলটির সঙ্গে আদর্শগত বৈরিতা সেই কংগ্রেসের দ্বারস্থ হলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সোনিয়ার চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই উদ্ধব ঠাকরে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন হয়েছেন, সঙ্গে এনসিপি আছে। সংখ্যার পরীক্ষায় উদ্ধব এভাবেই জিতে বেরিয়ে গেলেন। বিজেপি সংখ্যা দেখাতে পারল না, তাই দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার একদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। গণতন্ত্রের কী বিচিত্র খেলা! মহারাষ্ট্রের মানুষ বিজেপি-শিবসেনা জোটকেই বিপুল ভোটে জিতিয়ে ছিলেন, অথচ সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করা বিজেপি সরকার গঠন করতে পারল না। শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে তাঁর পিতা বাল ঠাকরের হিন্দুত্বের আদর্শ জঞ্জালে দিয়ে সোনিয়ার কংগ্রেস ও এনসিপি-র সঙ্গে সমঝোতা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হবার উদগ্র লালসায়। মহারাষ্ট্রের আমজনতা এমনটা যে হতে পারে, ভাবতেও পারেনি।

এবার নতুন সরকার যে 'কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম' ঘোষণা করেছে সেখানে রামমন্দিরের অযোধ্যার কোনও উল্লেখ নেই। শুধু কি তাই? যে শিবসেনা সাভারকারকে 'ভারতরত্ন' দিতে হবে বলে দাবি করত, সেই দাবিরও, কোনও উল্লেখ নেই। বাল ঠাকরে কংগ্রেস দলের ঘোর বিরোধী ছিলেন আদর্শগত কারণে। দলীয় পত্রিকা 'সামনায় কংগ্রেস দলের সোনিয়া-রাহুলের নিন্দা-সমালোচনা থাকত পাতাজুড়ে। বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের দিনটি অর্থাৎ ছয়ই ডিসেম্বর তারিখটা শিবসেনা 'শৌর্য দিবস' হিসেবে এত বছর পালন করে এসেছে, এবার কিন্তু এ ব্যাপারে তারা নিশ্চুপ।

নিরপেক্ষ বিশ্লেষকদের মতে বিজেপি ভুল করেছিল অজিত পাওয়ারের মতো একটি আপাদমস্তক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতার সঙ্গে সমঝোতা করে। সেটা যে শরদ পাওয়ারের পাতা ফাঁদ বিজেপির তাবড় তাবড় নেতারাও বুঝতে পারেনি। অমিত শাহর মতো অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদও সেটা বোঝেননি। এতে বিজেপির স্বচ্ছ ভাবমূর্তি কিছুটা ঘা খেল, এটা কখনই কাম্য ছিল না।

মহারাষ্ট্রের এই 'খিচুড়ি' সরকার কতদিন টেকে, এখন সেটাই দেখার। মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে কোনও ব্যবস্থাই স্থায়ী হতে পারে না, গণতন্ত্রে মূল্যবোধে আস্থা রাখা জনগণই শেষ কথা বলে। ▮

# মাদ্রিদের শীর্ষ-সম্মেলনে বিতর্কের ঝড়

**প্রিয়দর্শী সিনহা**

ঝড় উঠেছে স্পেনের মাদ্রিদে। বিতর্কের ঝড়, সমালোচনার ঝড়। পাশাপাশি চলছে গভীর আত্মবিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের দীর্ঘ সংগ্রামের কৌশল চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে খোলামেলা আলোচনাও। বিষয় অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত। আন্তর্জাতিক এই বার্ষিক সম্মেলন এবারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন মাত্রা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে পেতে গত বছরেই অর্থাৎ ২০১৮-তে বিপদের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েছে। সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা খুঁজতেই মিলিত হয়েছেন ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের দল। রয়েছেন বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট পরিবেশকর্মীরাও। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং উষ্ণায়ন রুখতে প্যারিস সম্মেলনে যে 'রুল বুক'-এর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তারই বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রায় দু' সপ্তাহের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। এছাড়া গত বছরে কয়োটো সম্মেলনে যে বিষয়গুলি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি, সেগুলি নিয়ে একমত হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সব থেকে বড়ো কথা, উষ্ণায়ন তথা দূষণের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই নতুন করে যাতে ২০২০-তেই শুরু করা যায় তার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতিও নেওয়া হবে। সম্মেলনে গুরুত্ব পাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যথাযথ ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও।

যে কথাটা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না তা হলো, মানবসভ্যতা তো বটেই, তামাম দুনিয়ার পরিবেশের সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো বিপদ গ্রিন হাউস গ্যাস। কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প এবং ওজন বিপজ্জনক মাত্রায় সদর্পে বিরাজ করে এই গ্রিন হাউস গ্যাসে। এরই দোসর কার্বন মনোক্সাইড এবং সালফার ডাই অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস। কখনও জীবাশ্ম তথা কয়লা আবার কখনও বা খনিজ তেল কিংবা বিভিন্ন রসায়নিক পদার্থের হাত ধরে এরা দূষণের ছোবল মারে পরিবেশের বুকে। তবে শিল্প বা যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং বিকিরণই যে দূষণ বা উষ্ণায়নের একমাত্র কারণ, তা কিন্তু নয়। ফসলের গোড়া পোড়ানোর পরিণতিও যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ রাজধানী দিল্লি। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের শাস্তি পেয়েছে কেরল আর উত্তরাখণ্ড। বন্যা-ধসে অজস্র প্রাণহানি, সম্পত্তি ধ্বংস। দেশের কোথাও আবার উধাও বর্ষাই। কখনও আবার ঘনঘন ঘূর্ণিঝড়ের চোখরাঙানি। অন্যদিকে দুনিয়াজুড়ে সমুদ্র দূষণের আশঙ্কা। বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। ভারসাম্য হারাচ্ছে জলস্তর, মরছে প্রাণী, উদ্ভিদ। অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ। ফুসফুসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কালান্তক ব্যাধি। সঙ্গে মানসিক অবসাদও। সব মিলিয়ে যেন এক দুঃস্বপ্ন!

পরিবেশের জটিল সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুঁজতে গবেষকদের সুপারিশে এক সময় চালু করা হয় কার্বন ক্রেডিট। ব্যাপারটা ঠিক কী? এটি হলো সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমানো। এই পারমিট কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। ফলে শুরু হয় কার্বন ট্রেডিং, কার্বন মার্কেট। এখন একে কেন্দ্র করেই বিশ্বজুড়ে শুরু হয়ে গেছে দড়ি টানাটানি। ঝগড়া, বিতর্ক। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে এরই অবসানের চেষ্টা চলছে এবারের পরিবেশ-শীর্ষ সম্মেলনে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, 'প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল' থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওপরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তাপমাত্রা। লক্ষ্যমাত্রা হতে হবে ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল' কাকে বলা হবে? সমস্যা সেখানেও। ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৭০০ সালে। ধরে নেওয়া হয়, তারপর থেকেই বাতাসে বাড়তে থাকে গ্রিন-হাউস গ্যাসের নির্গমনের মাত্রা। তাই ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় এই সময়টাকেই। কিন্তু এই নিয়ে মতান্তর আছে। কারও মতে লেভেলের পরিমাপ হওয়া উচিত ১৭৫০-এর প্রেক্ষিতে। অনেকে আবার মনে করেন ১৮৫০ থেকে

১৯০০-র মধ্যবর্তী সময়কেই প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিসেবে ধরা উচিত। সে যাই হোক না কেন, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড-সহ অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসের বিপজ্জনক মাত্রা সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে ২০১৮-তে। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব '৪০৭.৮ পার্টস পার মিলিয়ন'। মাত্র এক বছর আগেই যা ছিল ৪০৫.৫ সিপিএম। সাম্প্রতিক ঘনত্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৫০ সালের প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল-এর ১৪৭ শতাংশ। মিথেনের তুলনামূলক ঘনত্ব ২৫৯ শতাংশ। নাইট্রাস অক্সাইডের ঘনত্ব সেই সময়ের তুলনায় ১২৯ শতাংশ বেশি। সত্যিই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি গোটা বিশ্ব। গবেষকদের মতে, এই বিপদ থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে হলে ২০৩০ সাল পর্যন্ত গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা বছরে অন্তত ৭.৬ শতাংশ হারে কমাতে হবে। কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা তো বিপদসীমা ছাড়িয়ে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে দ্বিগুণেরও বেশি। এর সমাধান কোথায়? উত্তর খুঁজছে শীর্ষ-সম্মেলন।

প্রশ্ন একটাই, যে সব দেশ নিজেরাই দূষিত করে চলেছে পরিবেশকে, দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইতে তারা ঠিক কতটা আন্তরিক? সমালোচনার ঝড়কে সামাল দিতে এই উন্নত দেশগুলি কী করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

# শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পাবেন অনুপ্রবেশকারীরা নয়

**ভাস্কর ভট্টাচার্য্য**

নরেন্দ্র মোদী সরকারের একের পর এক পদক্ষেপ দেশের সংস্কার, উন্নয়ন ও সুরক্ষার প্রশ্নে আশাতীত সাফল্য, বিরোধীদের ক্রমশ কোণঠাসা করে ফেলছে।

বর্তমানে এনআরসি নিয়ে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জনমানসে ভীতির সঞ্চার করতে উঠেপড়ে লেগেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসমের নাগরিক পঞ্জি তৈরি হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও পর্যবেক্ষণে। বিজেপির কোনো ভূমিকাই ছিল না। বরং ১৯৮৪ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তির ফলস্বরূপ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আমি এই প্রসঙ্গে CAB বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রসঙ্গে আসতে চাই। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ১১ (পার্ট-২) অনুসারে। এবং সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৬, যা পরে অ্যামেন্ডমেন্ট হয় ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩, ২০০৫ এবং সর্বশেষ ২০১৫-তে।

পূর্বতন নাগরিকত্ব আইনে বলা আছে যারা অবৈধভাবে পাশপোর্ট ছাড়া ভারতে প্রবেশ করবে বা ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে দেশে থাকবে এবং মিথ্যা ও নকল দস্তাবেজ দেখিয়ে দেশে থাকবে, তারা দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে না। অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী যারা নিজের থেকে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেবে, তারা ভারতের নাগরিক থাকতে পারবে না।

শুনেছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর দুইটি দেশের পাশপোর্ট আছে। অতএব তাঁর নাগরিকত্বও পর্যবেক্ষণের মধ্যে পড়ে। ৩ ডিসেম্বর ২০০৪-এর পর ভারতের বাইরে জন্মগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি ভারতের নাগরিক থাকতে পারে না, যদি না সে তার জন্ম ভারতে নথিভুক্ত করায় নাগরিক হিসেবে ভারতে থাকাকালীন। এখানে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে এই ডিসেম্বর মাসেই। কারণ কে ভারতের নাগরিক আর কে নয় তা স্থির করার অধিকার ভারতের আছে।

এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে প্রশ্ন তোলেন যে অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশ ও পাশ্ববর্তী দেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। অবশ্য সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসন ছিল। তিনি বিরোধী নেত্রী ছিলেন। সুতরাং এই বহিরাগতরা যে বামেদের অবৈধ ভোটব্যাঙ্ক হয়ে উঠেছে তা তিনি বুঝেছিলেন। এখন তিনি শাসন ক্ষমতায় এসে সেই ভোটব্যাঙ্ককে কাজে লাগাচ্ছেন। যার জন্য এনআরসি ও নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতায় নেমেছেন। মোদী সরকার দেশের স্বার্থে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে যাতে দেশের বাইরে করা যায় তার জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনেছেন। বামপন্থী, কংগ্রেস ও তৃণমূলের তাই সবথেকে বেশি মাথাব্যথা। এরা দেশের সুরক্ষা, উন্নয়নের আগে নিজেদের উন্নয়ন ও ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে ভুল বোঝানোর কাজে নেমে পড়েছে। এখানে অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীর সংজ্ঞার প্রকারভেদ বোঝা দরকার।

ইউ এন দ্বারা যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাতে বলা আছে, যে-সমস্ত দেশের সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় ভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে বা সামাজিক ভাবে বঞ্চনার শিকার হওয়ার জন্য তাদের নিজেদের দেশে অসুরক্ষিত, তারা অন্য দেশের শরণ নিলে তাদের শরণার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে। অন্য কেউ এই সুযোগ পারে না। অর্থাৎ মোদী বলেছেন যদি বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, ইশাই, এই ভাবে অত্যাচারিত হয়ে আসে তবে তাদের শরণার্থী হিসেবে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ভারতে। কী ভুল বলেছেন ? এরা তো ওই সমস্ত দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সংখ্যাগুরুরা তো ওই সমস্ত দেশে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হন না। অর্থাৎ সোজা কথায় মুসলমানরা। সুতরাং তারা যদি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন, তারা অনুপ্রবেশকারী হিসেবেই চিহ্নিত হবেন। তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। তারা এদেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানে ভাগ বসাচ্ছেন। দেশকে সন্ত্রাসবাদের বেড়াজালে জর্জরিত করছেন। এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীর হয়ে দাবি করেছি যে ছয় বছরের যে সময় দেওয়া হয়েছে ভারতে থাকার জন্য ও নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তাও তুলে নিতে। কোনো দস্তাবেজের বা দলিলের দরকার হবে না। এই ধরনের যারা শরণার্থী

**মুসলমানরা যদি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন, তারা অনুপ্রবেশকারী হিসেবেই চিহ্নিত হবেন। তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। তারা এদেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানে ভাগ বসাচ্ছেন।**

তারা যে মুহূর্তে আবেদন করবেন একটি নির্দিষ্ট ফরমে, সেই মুহূর্তে তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যত শরণার্থী আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। সুতরাং একবার নাগরিকত্ব পেলে ও তার শংসাপত্র থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই এন আর সি-তে নাম উঠে যাবে।

আমাদের দেশ ১৩০ কোটির দেশ হতে পারে কিন্তু ধর্মশালা হতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব জনসংখ্যার নথি আছে। ভারতের বিরোধীদের নোংরা রাজনীতি, অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক করে ভোটে জেতার যে অন্যায় প্রবণতা তাই আজ মোদী সরকারের এই সঠিক পদ্ধতির বিরোধিতার একমাত্র কারণ।

*(লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী)*

# নাগরিকত্ব আইনে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধীদের আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন— 'ধর্মীয় নির্যাতনের দরুন পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসা সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দানের কথা এই বিলে বলা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিলে নাগরিকত্ব দানের কথা বলা হয়েছে, ছিনিয়ে নেওয়ার কথা নয়। বিলে সংবিধানের ৩৭১ নম্বর অনুচ্ছেদ কোনও ভাবেই লঙ্ঘিত হবে না। উত্তর-পূর্বের মানুষের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি বিলে রয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধন বিল আমাদের ইস্তাহারে ছিল এবং মানুষ ২০১৯-এ আমাদের প্রতি ব্যাপক জনাদেশ দিয়েছেন, তাই সরকারের দৃঢ় সংকল্পই হলো ইস্তাহারে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করা। নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারানুযায়ী কমিটি গঠিত হয়নি।'

রাজ্যসভায় সম্প্রতি বিলটি পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল, ২০১৯ সংসদের অনুমোদন পেল। লোকসভায় বিলটি গত ৯ ডিসেম্বর পাশ হয়েছে। রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপন করে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষ পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনে এই বিল নতুন আশার সঞ্চার করবে। তিনি আরও বলেন, এই বিল ভারতে কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, বরং প্রত্যেক ভারতীয়র অধিকার সমানভাবে সুরক্ষিত থাকবে। শাহ বলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। মোদী সরকার যে ধর্ম অনুসরণ করে, তা হলো ভারতের সংবিধান। 'আমরা কেবল সরকার পরিচালনার জন্যই ক্ষমতায় নেই, বরং সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ক্ষমতায় রয়েছি' বলে শ্রী শাহ মন্তব্য করেন। বিতর্কের জবাবে শ্রী শাহ বলেন, দশকের পর দশক ধরে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার মানুষজনকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষ্যেই এই বিল। তবে, নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে এদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংখ্যালঘু ওই ধর্মগুলির মানুষজন যেদিন ও যে বছর থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তখন থেকেই তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এমনকী, এদের বিরুদ্ধে যাবতীয় মামলা ও আইনি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি, তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থকেও সুরক্ষিত রাখা হবে। শ্রী শাহ আরও বলেন, শরণার্থী এই মানুষজনের পাসপোর্ট বা ভিসার মেয়াদ যদি ফুরিয়েও যায়, তাহলেও তাঁদের অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

শ্রী শাহ আরও বলেন, এই বিলে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোনোভাবেই নিশানা করা হয়নি। তবে, অনুপ্রবেশকারীদের দেশে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি জানান, বিগত বছরগুলিতে ইসলামিক দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে। এই দেশ দুটিতে হয় সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়েছে অথবা তাঁদের ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়েছে। এই কারণেই তাঁরা ভয়ে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ধর্মীয় কারণে ভারতবর্ষ বিভাজন এবং ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধন বিল

নিয়ে আসা হয়। তিনি বলেন, 'যদি এই বিল ৫০ বছর আগে আনা হতো, তা হলে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভবই হতো না। ইতিহাসের পাতায় সবচেয়ে বড়ো ভুল হলো— ধর্মীয় কারণে ভারতবর্ষের বিভাজন। নাগরিকত্ব সংশোধন বিল আমাদের ইস্তাহারে রাখা হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষ ২০১৯ সালে আমাদের বিপুল জনাদেশ দিয়েছেন। তাই, এই প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ'।

কেন ওই তিনটি দেশের সংখ্যালঘুদেরকেই বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং কেন মুসলমানদের এই বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি— এ সম্পর্কিত একাধিক প্রশ্নের জবাবে শ্রী শাহ বলেন, অতীতে বিভিন্ন সময়ে উগান্ডা ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। তাহলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দানের ব্যাপারে কেন বিবেচনা করা হবে না! তিনি আরও জানান, অতীতে বিভিন্ন সময়ে একাধিক সরকার পরিস্থিতি ও ঘটনাক্রমের ভিত্তিতে সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার শর্ত পূরণের বিষয়টিকে হাতিয়ার করে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান করেছে। এখন এই বিলের মধ্য দিয়ে ওই তিনটি দেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে এদেশে চলে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্বদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। শ্রী শাহ আরও জানান, বিগত পাঁচ বছরে ওই তিনটি দেশ থেকে চলে আসা ৫৬০ জনেরও বেশি মুসলমানকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকী, পূর্বতন ইউপিএ সরকার কেবল ১৩ হাজার হিন্দু ও শিখকে নাগরিকত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু মোদী সরকার হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বী-সহ ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার ছয়টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার সুরক্ষায় নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্য সভায় বলেন, এই বিলের পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো— ওই তিনটি দেশ থেকে বাধ্য হয়ে এদেশে চলে আসা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া। এই সরকার ২০১৫ সালেও বিলটি নিয়ে এসেছিল কিন্তু বিলটি অনুমোদিত হয়নি। তখন থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আসন্ন নির্বাচনগুলিতে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যে সরকার এই বিল নিয়ে আসেনি। এমনকী, এই বিলের মাধ্যমে ধর্ম- নিরপেক্ষতার ব্যাপকতাকেও খাটো দেখানো হয়নি। মোদী সরকার সমগ্র বিষয়টিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করেছে। ওই তিনটি দেশে ধর্মীয় কারণে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘু এমন সমস্ত সম্প্রদায়কে এই বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ ওই তিন ইসলামিক দেশে ধর্মের ভিত্তিতে তাঁদের কোনও রকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি। শ্রী শাহ পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় নাগরিকদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। তিনি বলেন, এই বিলের মাধ্যমে কোনোভাবেই তাঁদের নাগরিকত্বে আঁচ পড়বে না। তিনি বিরোধীদের অনুরোধ করেন, বিলটি সম্পর্কে রাজনৈতিক দ্বিচারিতা না করতে এবং সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজনের রেখা না টানতে। 'এই বিলের উদ্দেশ্য হলো— নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া নয়, পাইয়ে দেওয়া' বলে শ্রী শাহ অভিমত প্রকাশ করেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের আশঙ্কা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখা হবে। এমনকী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মানুষ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তার সমাধান-পদ্ধতি এই বিলে রয়েছে। বিলে যে সমস্ত সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা নিয়ে বিগত এক মাস ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের সঙ্গেই ম্যারাথন আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এমনকী, তিনি সিকিমের মানুষকেও আশ্বস্ত করে বলেন, এই বিলের ফলে কোনও ভাবেই তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না। সমগ্র বিষয়টিকে তিনি রাজনৈতিক আদর্শগত দিক থেকে না দেখে, মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার অনুরোধ জানান।

শ্রী শাহ বলেন, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় অন্তর্ভুক্ত এলাকা এবং ১৮৭৩ সালের বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশনের অধীন এলাকা-সহ অসম, মেঘালয়, মিজোরাম বা ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সংশোধিত এই আইনের ধারাগুলি বলবৎ করা হবে না। এই বিলে নাগরিকত্ব আইনের তৃতীয় তফশিলের সংশোধন করে ওই তিনটি দেশে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের মানুষকে ১১ বছরের পরিবর্তে ভারতে বিগত পাঁচ বছর ধরে বসবাসরত প্রমাণ বা নথিপত্র পেশের ভিত্তিতে যোগ্য নাগরিকত্ব প্রদানের সংস্থান রয়েছে। শ্রী শাহ জানান, আজ এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য দিয়ে মণিপুরকেও ১৮৭৩ সালের বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশনের 'দ্য ইনার লাইন'-এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

অসমবাসীদের আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক পরিচিতি সুরক্ষিত রাখা হবে। তিনি খেদ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৮৫'র অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারানুযায়ী, বহু দশক ধরে যে কমিটি গঠিত হওয়ার কথা ছিল, তা নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত গঠিত হয়নি। ভূমিপুত্রদের অধিকার সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত রাখতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় উল্লেখ করে শ্রী শাহ অসম চুক্তির বিভিন্ন ধারা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওই কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবেদন জমা দেওয়ার অনুরোধ করেন।

এই বিলে উপরোক্ত তিনটি দেশে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে এদেশে চলে আসা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের যে প্রস্তাব রয়েছে, তা ভারতীয় সংবিধানের এমনকী, ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ কোনোটিকেই লঙ্ঘন করবে না বলে জানিয়ে তিনি বলেন, এই বিলের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৭১ নম্বর অনুচ্ছেদের কোনও ধারাও লঙ্ঘিত হবে না।

নাগরিকত্ব বিলে অন্যান্য সংশোধন প্রসঙ্গে শ্রী শাহ জানান, বিলের ৭ (ঘ) ধারাতেও সংশোধনের কথা বলা হয়েছে, যাতে করে অনাবাসী ভারতীয় নাগরিক কার্ড হোল্ডারদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া যায়।

বেশ কয়েকজন সংসদসদস্য এই বিলকে বিতর্কিত বলে যে দাবি তুলেছেন, তার জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আদালতে বিলটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হলেও তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এমনকী, কালের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হবে। ■

# বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে এম এল এ, এমপিরা চুপ ছিলেন কেন?

**সিতাংশু গুহ**

'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' নিয়ে আলোচনায় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গে বিএনপি-র নাম উচ্চারণ করেছেন। ঢাকায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল আলমগির এতে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রত্যুত্তরে অমিত শাহ বলেছেন, 'চাইলে প্রমাণ পাঠিয়ে দিতে পারি'। অন্য এক প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেছেন, 'বিএনপি আমলে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত ছিলেন'। একথা শুনে আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'আমি হাঁসবো না কাঁদবো ঠিক বুঝতে পারছি না'। সঙ্গে তিনি যোগ দেন, আওয়ামি লিগ আমলে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকেন। বিদেশমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই'! এই তিন নেতার কথা শুনে আমার ত্রিশঙ্কু অবস্থা, আমি হাসবো না কাঁদবো ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভারতের লোকসভায় শিলচরের এমপি ড. রাজদীপ বেশ জোরালো কণ্ঠে বলেছেন, জীবন বাঁচাতে আমার বাবা সব ছেড়ে-ছুঁড়ে রাতের অন্ধকারে সিলেট থেকে পালিয়ে শিলচর চলে আসেন। অভিনেত্রী ও বিজেপি নেত্রী রুপা গাঙ্গুলি বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে বোরখা পরে পালাতে হয়েছিল'। ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা উঠছে। হয়তো আরও উঠবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এবং বাংলাদেশের সংসদে এ নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা বিধানসভার অধিকাংশ এমএলএ-র পূর্ব-পুরুষ রাতের অন্ধকারে পূর্ব-পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু কেন এসেছেন, তা বেমালুম ভুলে গেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব' নিজেই একটি দৃষ্টান্ত; তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী তো এখনো চাঁদপুরে। নারায়ণগঞ্জের জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ড. অমর্ত্য সেন বা গায়ক নচিকেতা, সবাই পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু এরা কখনো মুখ খুলেননি। গত বাহাত্তর বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের জন্যে একটি শব্দও ব্যয় করেনি!

বাংলাদেশের সংসদে এখন ১৮ জনের বেশি সংখ্যালঘু এমপি আছেন। কমবেশি আগেও ছিলেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ব্যতীত এদের কারো মুখে কখনো সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা শোনা যায়নি। ক্যাব বা এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশে এ নিয়ে শঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। শঙ্কার স্পষ্ট কারণ হচ্ছে, একটি বিরাট সংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশ থেকে মানুষ ভারত গেছে বা এখানো যাচ্ছে, এটি অস্বীকার করা মূর্খতা। আমরাই তো প্রায়শ বলি, 'আমাদের গ্রামে পঞ্চাশ ঘর হিন্দু ছিল, এখন আছে পাঁচ ঘর। সর্বত্র একই চিত্র। ক্যাব হয়ে যাওয়ার পর ছিন্নমূল, রাষ্ট্রহীন শরণার্থী যাঁরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরা একটি রাষ্ট্র পাবেন, হয়তো তারা তখন নির্ভয়ে মুখ খুলবেন। অথচ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী কারো ভারত যাওয়ার কথা ছিল না। ক্যাব নিয়ে এখন বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে, এমনকী পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, ক্যাব করে ভারত হিন্দুত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী দেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী অন্যকে 'সবক' দিচ্ছেন!

**নারায়ণগঞ্জের জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ড. অমর্ত্য সেন বা গায়ক নচিকেতা, সবাই বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছেন, কিন্তু এরা কখনো মুখ খুলেননি। গত বাহাত্তর বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বাংলাদেশের নির্যাতীত হিন্দুদের জন্যে একটি শব্দও ব্যয় করেনি!**

মাত্র ক'দিন আগে বিজিবি সীমান্তে বেশ কিছু মানুষ আটক করে। বিজিবি বলেছে, এরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'। পুলিশ তদন্ত করে বলেছে, এঁরা বাংলাদেশের নাগরিক। কাজের সন্ধানে ভারতে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। এটাই বাস্তবতা। এখানে বিজিবি ও পুলিশ উভয়ই সঠিক। বিজিবি বৈধ কাগজপত্র ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করাকে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলবে। তদন্ত বিজিবি'র কাজ নয়, পুলিশের কাজ। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, ওঁরা বাংলাদেশি। সংখ্যালঘু হিন্দুরা কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে ভারত যায়নি, গেছে অত্যাচার এবং নিরাপত্তাহীনতার জন্যে। এদিকে ক্যাব নিয়ে টানাপোড়েনে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. মোমেন'র ভারত সফর বাতিল হয়েছে। অমিত শাহের বক্তব্য, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে' জবাবে তিনি বলেছেন, 'ক্যাব ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে দুর্বল করবে'। হায়রে হায়, নিজের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো খবর নেই, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর ঘুম নেই? ভারত নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ অনেক সময় নষ্ট করেছেন, গত ছয় দশক তাই দেখছি। আসলে ভারতের চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের উচিত বাংলাদেশকে কীভাবে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, মানবকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া।

*(লেখক আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি)*

# চিঠিপত্র

## ক্ষমতার অপব্যবহার কাম্য নয়

সরকার গঠন খেলা বা প্রতিযোগিতা নহে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সমর্থন সরকার গঠনের মূল ভিত্তি। সুবিধাবাদী ও বা ধান্দাবাজী সাময়িক লাভ হলেও স্থায়ী ভাবে তার খারপ প্রভাব পড়ে। এ কারণেই কংগ্রেস দলের করুণ অবস্থা। বিগত লোকসভায় বিজেপি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে, যেটা বিজেপির সমর্থক ও নেতারা আশা রাখেনি। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সাধারণ মানুষ রেয়াত করবে না, বিজয়ী দলের দায়িত্ব অনেক, দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী দেশের বৃহত্তম গোষ্ঠী অনেক আশা ও ভরসা করেই বিজেপিকে বিপুল ভাবে ভোট প্রদান করেছে। দেশবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তি খুবই সক্রিয়। কোথাও সরাসরি, আবার কোথাও নিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে।

আমরা দেখেছি যাদের সংগঠিত সভায় দেশবিরোধী পাকিস্তানি উগ্রবাদী নেতা ভাষণ দেয়, সেখানে আওয়াজ ওঠে ভারত তেরে টুকরে টুকরে হোঙ্গে, সেই সংগঠিত দলের নেতাকেই, দলে নেবার জন্য ভারতে কয়েকটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী দল লালায়িত হয়। বাজারি সংবাদপত্র সেই নেতার মহিমা প্রচার করে, লোভি দেশবিরোধিরা সুযোগ খুঁজবে। তাই হঠকারি ভাবে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবেন না। সংযম ও সঠিক চিন্তা ও কার্যাবলী। দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে— আমরা সেই আশাই করি।

**—সঞ্জয় দত্ত,**
হুগলী।

## এনআরসি হলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং ধর্ষণও কমবে

'যে নদী হারায় স্রোত চলিতে না পারে / সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে'— সদ্য তিনটি বিধানসভার উপনির্বানে বিজেপি পরাজয়কে কেন্দ্র করে নানান জল্পনা তৈরি হয়েছে কর্মীদের মধ্যে। কেউ বলছেন পুরোনো ও নব্যের অসমন্বয়ের প্রভাব, কেউ আবার বলছেন সঠিক প্রার্থী বাছাই হয়নি আর এই নিয়ে মিডিয়ায় চলছে হারের পর্যালোচনা। কিন্তু বিজেপি হলো নদী, শত শৈবালেও স্রোত হারাবে না। যাইহোক, প্রথম কারণটি অবশ্যই রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অন্যান্য দলের নেতাদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি ও ডিটেনশন ক্যাম্প বিজেপির চালু করার জোরালো প্রচেষ্টার বিপরীতে নেত্রীর আশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হতে দেব না। আরও গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হলো দিলীপদা নাকি বলেছেন, দু' কোটি মানুষকে বিতাড়িত করবেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বিপরীতে নেত্রীর আশ্বাস এখান থেকে কাউকে তাড়ানো হবে না। এই প্রসঙ্গে দিলীপদা একটুকুও ভুল বলেননি তিনি নিশ্চয়ই জানেন দু' কোটি অনুপ্রবেশকারী এই বঙ্গে রয়েছে তার জন্য দ্রব্যমূল্য দিনদিন বেড়েই চলেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা এখনও সংখ্যাগুরুদের দ্বারা বীভৎসভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে আবার ঠিক একইভাবে এই দেশেও অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুরা একইরকম হিংসা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রিয়াংকা রেড্ডিকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা-সহ ভারতে এইরকম নৃশংস অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা নির্ভয়া কাণ্ড কেউ ভুলে যাইনি। কী বীভৎসভাবে রেপ করে চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

এই সমস্ত অপরাধীদের নামের তালিকাটা একটু দেখুন। তাহলেই বুঝতে কষ্ট হবে না। আর এর জন্যই এনআরসি-র অবশ্যই প্রয়োজন। এই অপরাধীদের ভারত থেকে তাড়াতেই হবে নইলে আরও নৃশংস ঘটনার সাক্ষী হতে হবে। একদিকে জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে আর্থিক মন্দা, উল্টে কর্মসংস্থান তো হচ্ছেই না। আসলে আমাদের রাজ্যে জনখাটা, মজুর ও লেবার শ্রেণীর সংখ্যাই বেশি এবং নিরক্ষর। এই শ্রেণীকে মিথ্যে বুঝিয়ে মগজধোলাই করা হচ্ছে যে এনআরসি হলে তোমাদের এদেশ ছাড়তে হবে। সত্যিই সেলুকাস! কী বিচিত্র এই বাঙ্গলা। মজার বিষয় দেখুন। সদ্য তিন উপনির্বাচনে জিতে শাসক দলের কোনো নেতাই কিন্তু বলছেন না যে, ইভিএম খারাপ ছিল। আসলে জনগণের বিচার বিবেচনার কাছে সব নামীদামী নেতারা ঠুঁটো জগন্নাথ। তবে পরিস্থিতির নিরিখে আমি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বকে বলব যে এখনো সময় আছে ব্রাত্য করে রাখা পুরোনো বিজেপি কর্মীদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনুন, পাশাপশি আরএসএসের কার্যকর্তাদের বেশি বেশি করে কাজের সুযোগ দিয়ে তাঁদের নিরাপত্তা দিন এবং পুরোনো ও নব্য মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে এনআরসি সম্পর্কে বাঙ্গলার মানুষকে সঠিক তথ্য দিন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যবাসী জানে ২০১১-য় বাঙ্গলায় পরিবর্তনের পর শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতীদের বয়স বেড়েছে, কর্মসংস্থান নেই, স্থায়ী কর্মচারী নেই, ডিএ পে-কমিশন নিয়ে টালবাহানা, নিয়োগের নামে ঘোটালা, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সামান্য বেতন দিয়ে ভবিষ্যৎ শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত, বিজেপি ও আরএসএসের কর্মীদের রেয়াত করা হচ্ছে না। উপনির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি হলো ভয়াবহ। অতএব, সদ্য উপনির্বাচনে ফলাফলে বঙ্গ বিজেপির হার। তবে আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সকলকে নিয়ে চললে সুফল মিলবেই এবং দল ভাঙানোর রাজনীতি সাময়িক ফলপ্রসূ হয় আগামীতে এঁরাই 'ঝাঁকের কইয়ের মতো পুরোনো দলে মিশবে'। তাই, বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের কাছে আর্জি সদ্য মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনে ভুলত্রুটি শুধরে নির্বাচিত সভাপতিদের নিয়ে জনসংযোগে নেমে পড়ুন।

**—রাজু সরখেল,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

# জাতীয় নাগরিকপঞ্জী প্রসঙ্গে

এনআরসি বিলটি বিগত এনডিএ সরকারের আমলে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির হাত ঘুরে ৪ জানুয়ারি ২০১৯ লোকসভায় এই বিল 'নাগরিকত্ব সংশোধনী ২০১৬' পাশ হয়। কিন্তু সিপিএম কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করায় বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয়নি। কারণ তারা শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য দেখছেন না।

উল্লেখ্য ১৯৫১ ও ১৯৬৭ সালে জেনেভা ও নিউইয়র্কে গৃহীত জেনেভা রিফিউজি কনভেনশনে যখন কোনো ব্যক্তি কী জনগোষ্ঠী তাদের মূলদেশে ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগোষ্ঠীর কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে অত্যাচারিত হয়ে অন্যদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, অপরাধী নয় বা মানবিকতা বিরোধী কাজ কর্মে যুক্ত নন, তারা শরণার্থী।

আর কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী শরণার্থীদের জন্য উপরে উল্লেখিত কারণগুলি ছাড়া অন্য কারণে বা উদ্দেশ্যে অন্য দেশে বৈধ কোনো নথিপত্র না না থাকলে তিনি অনুপ্রবেশকারী হবেন এবং সে দেশের আইন অনুযায়ী দণ্ডিত হবেন।

উল্লেখ্য, দ্বি-জাতি তত্ত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা হিন্দু রক্ত ঝরিয়ে পাকিস্তানের জন্ম। আবার ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ সহযোগিতায় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্ম দেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু বহির্বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ ভারত নিজেই ধর্মনিরপেক্ষ নয়, সে কী করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। সে কারণে তড়িৎ গতিতে লোকসভায় ও রাজ্য সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় কিনা বাধায় ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। সংবিধান পরিবর্তন করেন।

পরবর্তী ইতিহাসের পট পরিবর্তন ঘটে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে। বাংলাদেশ পুনঃইসলামিক রাষ্ট্রে পরিবর্তিত হয় এবং পুনঃ সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নেমে আসে। ফলে রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার হিন্দু পরিবারকে ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার্থে ভারতে এখনও চলে আসতে হচ্ছে।

অপরদিকে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়াতে নির্যাতনকারী মুসলমানরাও রাতের অন্ধকারে ভারতকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভুল পদক্ষেপে হিন্দু ধর্ম বিলীনের পথে এগিয়ে চলছে। যদি আমরা অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখি— দেখব ''দিল্লিতে গদির লোভে ৩৭০ ধারা, বাঙ্গলায় রামনামে অগ্নিশর্মা, নামাজ পড়া।'' কাজেই দেশ ও ধর্ম রক্ষার্থে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও এনআরসি একান্ত প্রয়োজন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**—রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,
কোচবিহার।

# রামমন্দির বনাম বাবরি মসজিদ

হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবেলল-এর একটা থিওরি ছিল। একটা মিথ্যাকে বারবার বেশ জোরের সঙ্গেই প্রচার করলে সেটাকেই সাধারণ মানুষ সত্য বলে মনে করেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাবরি মসজিদ সম্বন্ধে রায়দানের পরেও এ দেশের বামপন্থীরা ও কিছু বুদ্ধিজীবী তা মানতে পারছে না যে বাবরি মসজিদের স্থানেই ছিল রামমন্দির। কুখ্যাত হিন্দু বিদ্বেষী মোঘল সম্রাট বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মির বাকি রামমন্দির ধ্বংস করে যে মসজিদ তৈরি করেছিলেন তার প্রমাণ পত্র নীচে উল্লেখ করছি : (১) ঐতিহাসিক কে এস লাল লিখেছেন, ১৫২৮ সালে বাবরের আদেশে কমান্ডার মীর বাকি অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন। (২) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গবেষক নুসরাত জাহান আয়ষা সিদ্দিকা তার বই ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার বই-এর ২০ পৃ. লিখেছেন 'সম্রাট বাবরের নাম সবারই জানা। তার আদেশে বাঁকি খাঁ অযোধ্যার শ্রীরামজন্ম ভূমি ধ্বংস করে তাতে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার হিন্দুর রক্ত রঞ্জিত চুনবালির প্লাস্টার করে বাবরি মসজিদ রূপান্তরিত করেছিলেন।' (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার লেখেন, ''অন্যান্য মুসলমান হানাদারদের মতো বাবরও হিন্দুমন্দির ও হিন্দু বিগ্রহ ধ্বংস করার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীর বাকী অযোধ্যার রামজন্মভূমি ভেঙে তাতে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুর রক্ত চুনবালিতে মিশ্রিত করে ইট গেঁথে বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ করেছিল। (R.C. Majumdar B.V.B. VII P. 307) (৪) এই রামমন্দির পুনরুদ্ধার কল্পে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে ৭৭ বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শিখ গুরুরাও অসীম সাহসের সঙ্গে ওইসব যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। হিন্দুদের রক্তে সরযূ নদীর জল লাল হয়ে যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Christopha Jafferlat তার বই The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990's (Penguin Books) পৃ. ৪০২ ৭৭ বার যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

বাবরের সময় ৫ বার। হুমায়ুনের সময় ১০ বার। আকবরের সময় ২০ বার। অওরঙ্গজেবের সময় ৩০ বার। সাহদিত আলির সময় ৫ বার। নাসিরুদ্দিন হায়দারের সময় ৩ বার। ওয়াজিদ আলি শাহের সময় ২ বার। ইংরেজ আমলে ২ বার। তা সত্ত্বেও Idols of Hindu gods and goddesses are still alive (P. 402)

এখানে উল্লেখ্য, যে অয়োধ্যা শহরের নিকটবর্তী গ্রাম শাহজানওয়ালায় এখনো মীর বাকির সমাধি রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ওই গ্রামে ৫ একর জমির উপর নতুন বাবরি মসজিদ তৈরির আর্জি জানিয়েছেন।

**—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
**প্রণব**
পড়ুন ও পড়ান

# প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিশুকে বড়ো করার দায়িত্ব মা-বাবার

প্রত্যেক বাবা-মা-ই চান তার সন্তান যেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পড়াশোনায় ভালো ফল করে উন্নতি সাধন করে। তবে এটাও ঠিক, শুধু পড়াশোনায় ভালো হলেই চলবে না। পাশাপাশি সন্তানকে সময়োপযোগী করে তোলাও একজন বাবা-মা'র কর্তব্য হওয়া উচিত। সে যেন বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের পরিবেশ- পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে-গুছিয়ে, লড়াই করে এগিয়ে যেতে পারে। সন্তানকে সুস্থ জীবন দিতে হলে যে যে বিষয়গুলো করণীয়—

**বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি :** বাবা-মায়ের চাকরি যদি বদলির হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শিশুরা বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়। এমনও হয়ে থাকে, তারা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বিষয়টা কিন্তু একটা শিশুর বেড়ে ওঠার পক্ষে বেশ উপযুক্ত বিষয়। কারণ তারা ছোটো থেকেই নানা জায়গায়, ভিন্ন ধরনের মানুষদের মধ্যে বেড়ে উঠছে। কখনও তাদের নতুন নতুন ভাষা রপ্ত করতে হচ্ছে, তো কখনও আবার ভিন্ন আচার-ব্যবহার। এগুলো তাদের কাছে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ বললে ভুল বলা হবে না। গতানুগতিক পরিবেশ এবং কাজের মধ্যে এরা কখনওই বেড়ে ওঠে না। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ছোটোরা বুদ্ধিমান এবং মিশুকে স্বভাবের হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব শিশু এরকম পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে উঠছে না তাদের ক্ষেত্রে বলতে হবে, বাড়ির বড়োরা যেন সন্তানের নানা ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে বড়ো করেন। তা সে ঘরের কাজই হোক কিংবা বাইরে খেলাধুলা। এমনকী ছোটো ছোটো প্রজেক্টও করতে দিতে পারেন আপনার সন্তানকে। এভাবেই মস্তিষ্ককে সবসময় সচল রাখতে হবে। তবে এই ধরনের কোনও কাজের মধ্যে যেন ওদের একঘেয়েমি না আসে। আসলে একই রকম গতানুগতিক জীবনধারণের মধ্যে দিয়েই আসে অলসতা ও স্থবিরতা। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ প্রতিকূলতার সঙ্গে শিশুর খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বাড়ায়।

**আগ্রহকে উৎসাহ :** আপনার সন্তান কী করতে ভালোবাসে সেটা আপনার থেকে ভালো আর কে বুঝবে? তাই লক্ষ্য রাখুন আপনার খুদেটি কোন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সে কি খেলাধুলা করতে সেভাবে ভালোবাসে, নাকি নাটক, গান, নাচ। যেটাতেই তার আগ্রহ আছে সেই বিষয়ে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। তবে সেগুলো শিখে 'কিছু করতে হবে তোমাকে'— এরকম কথা শিশুকে বলা ঠিক হবে না।

**আবেগকে প্রশ্রয় :** শিশু মানেই তার মধ্যে হাজারো প্রশ্নের উকিঝুঁকি। আর সেই প্রশ্নের উত্তর সে তার মা, বাবা, ঠাকুমা, দাদু, দিদার থেকেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। ছোটোদের এই কৌতূহলকে দমন করবেন না যেন। ওকে ওর মতো প্রশ্ন করতে দিন। যতটা সম্ভব সবাই মিলে ওর প্রশ্নের উত্তর দিন। এতে যেমন শিশুর মধ্যে জানার কৌতূহল বৃদ্ধি পাবে, তেমনই সে ভাববে, তারও এই পরিবারে সমান কদর আছে।

**ব্যর্থতায় ভয় নয় :** ছোটো থেকেই শিশুকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তার জীবনে ব্যর্থতা এলেও সে কোনও ভাবে যেন হাল না ছাড়ে। যেমন ধরুন কোনও কিছু সে পড়ছে কিংবা লিখছে, অথচ মনে থাকছে না। বারংবার একই ভুল করে যাচ্ছে সে। এরকম হলে কখনও বকাবকি করবেন না। বরং ওকে বলুন, ভুল করছ, একদিন তুমি এই বিষয়টাই খুব ভালো পারবে। এতে ওর মধ্যে আশার সঞ্চার হবে।

**তুলনা নয় :** স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব কিংবা মনীষীদের কথার উল্লেখ করে ছোটোদেরকে তার মূল্যবোধ শেখাতেই পারেন। কিন্তু তারই সমবয়সি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সন্তানের তুলনা না করাই ভালো। এতে ওদের মধ্যে চাপা রাগ, কষ্ট, ক্ষোভ তৈরি হতে পারে। তাই ভালো শিক্ষা দিতে গিয়ে সেখানে কারো সঙ্গে তুলনা না করাই ভালো।

**শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ :** সন্তানকে নজরে রাখার জন্য অবশ্যই শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। সন্তান হয়তো বাড়িতে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে পড়াশোনা নিয়ে, কিন্তু স্কুলে গিয়ে চুপ থাকছে। আবার অনেকে আছে বাড়িতে অনেক কথা বললেও, বাইরে কিংবা স্কুলে একেবারেই চুপ করে থাকে। আপনার তার মধ্যে এরকম কোনও সমস্যা আছে কিনা, জানতে হলে অবশ্যই শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

**টিভি দেখা কম :** ছোটোরা টিভি দেখতে পছন্দ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই বস্তু থেকে তাদের যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এটা এক কথায় বোকা বাক্স। বরং সেই জায়গায় যদি কোনও শিশু বই পড়ে, ছবি আঁকে তাহলে তার মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ছড়া বা গল্পের বই বাচ্চার মনে প্রভাব বিস্তার করে। নতুন শব্দ শিখতেও সাহায্য করে।

**বিকাশে প্রকৃতি :** শিশুর বিকাশে অত্যন্ত জরুরি প্রভাব বিস্তার করে তার চারপাশের প্রকৃতি। মানুষ ছাড়াও গাছপালা, পশু-পাখির সঙ্গে কোনও শিশু বড়ো হলে তার মানসিক বিকাশ ভালো হয়। গাছপালা-পশুপাখির প্রতি মমত্ববোধ থাকলে সেই শিশুর মধ্যে একটা সময় উপকারী মনোভাব তৈরি হয়ে যাবে।

**শব্দ বৃদ্ধি :** বর্তমানে ছোটোদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করার প্রবণতা বেড়েছে অভিভাবকদের। এটাও ঠিক, আজকে প্রতি পদক্ষেপে ইংরেজি ভীষণ প্রয়োজনীয়। তবে সন্তান ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে বলে তার মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা জন্মাবে না, এটাও কিন্তু ঠিক নয়। ছোটো থেকেই বাড়িতে বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং লিখতে বা পড়তে পারা, এটা শেখানোর দায়িত্ব অভিভাবকদের।

*—সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ*

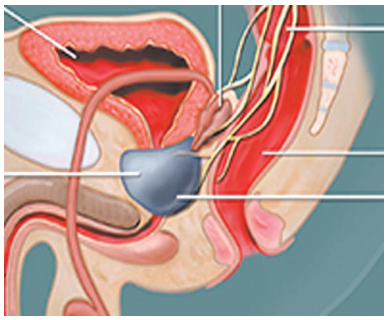

# প্রস্টেটের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি অমৃতসম

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য

আমাদের ছেলেবেলায় বড়দিনের ছুটিতে পাড়ার ছোটো ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কলকাতা ঘোরাতে নিয়ে যেতেন বিভাসদাদু। ধুতি পরতেন। দাদুর ঝোলায় থাকত একটা ছোটো খালি বোতল। গাড়িতে যেতে যেতে দাদু কিছুক্ষণ পরপরই ধুতির আড়ালে ওই বোতলে প্রস্রাব করে ফেলে দিতেন। বলতেন— বয়স হয়েছে, বেগ ধরে রাখতে পারি না কী করব? তখন হাসাহাসি করলেও এখন বুঝি দাদুর সমস্যাটা আসলে ছিল প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা, যা ৫০ বছরের পরে ৬০ শতাংশ মানুষের হতে পারে।

প্রস্টেট গ্ল্যান্ড পুরুষের একটি সহায়ক সেক্স গ্ল্যান্ড। প্রস্টেট নিঃসৃত তরল বীর্য তৈরিতে, বংশধারা রক্ষা করতে, স্পার্মের পরিচর্যা ও সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং টেস্টোস্টেরন প্রভৃতি কিছু হর্মোন নিঃসরণের কাজে যুক্ত থাকে। প্রস্টেটের অসুখকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায়— (১) প্রস্টেটের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ও (২) প্রস্টেটের সংক্রমণ (প্রস্টেটাইটিস)।

**১। প্রস্টেটের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা :** মানুষের মূত্রথলি (ব্লাডার) থেকে প্রস্রাব নিঃসরণের জন্য যে মূত্রনালী নির্গত হয়, তাকে ঘিরে থাকে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড। ছোটোবেলায় প্রস্টেট আকারে ছোটো থাকে। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে এটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। পূর্ণ যৌবনে এর ওজন হয় ১৫-১৮ গ্রাম। ৪৫-৫০ বছর বয়সের পর এই গ্রন্থি কারোর কারোর ক্ষেত্রে খুব দ্রুত বেড়ে যায়। বাড়তে বাড়তে প্রস্টেটের ওজন ২০ গ্রামের বেশি হলেই তাকে বলা হবে এনলার্জড প্রস্টেট। এই বৃদ্ধির কারণ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অতিরিক্ত ফ্যাট ও ক্যালরিযুক্ত খাবার খেলে প্রস্টেট বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। আবার পরিবারে বড়োদের এই রোগ থাকলে পরবর্তী প্রজন্মে রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রস্টেট যেহেতু মূত্রনালীকে ঘিরে থাকে, তাই প্রস্টেট হলেই মূত্রনালীর উপর চাপ পড়ে। ফলে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয়, সরু হয়ে প্রস্রাব হয় বা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়তে থাকে এবং প্রস্রাব পুরোপুরি নির্গত না হয়ে কিছুটা ব্লাডারে থেকে যায়। একে বলে রেসিডুয়াল ইউরিন। এই অবস্থায় ব্লাডারের পেশীগুলি জোরে চাপ দিয়ে মূত্র নিঃসরণের চেষ্টা করে। এই ভাবে চলতে চলতে ব্লাডারের পেশীগুলি এতে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে যে অল্প পরিমাণ মূত্র জমা হলেও পেশীগুলি চাপ দিয়ে মূত্র বার করে দিতে চায়। তখন প্রস্রাব ধরে রাখা যায় না, বারবার প্রস্রাব পায়। রেসিডুয়াল ইউরিন থেকে ইনফেকশানের কারণে প্রস্রাবে রক্ত আসা, ইউটিআই, কিডনির স্টোন ইত্যাদি সমস্যাও হতে পারে। জটিল ক্ষেত্রে প্রস্রাব সম্পূর্ণ আটকে গেলে ক্যাথেটারাইজেশন বা অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

প্রস্টেটের এই বৃদ্ধি দু'ধরনের হয়— সাধারণ (বিনাইন) ও ক্যান্সার। দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষণ মোটামুটি এক। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ছাড়াও পেটের আলট্রাসাউন্ড, সিটি স্ক্যান এবং রক্তের পি.এস.এ পরীক্ষার সাহায্যে এ দুটির পার্থক্য করা সম্ভব। তবে প্রস্টেট ক্যান্সারের গতি অত্যন্ত ধীর বলে অনেক সময়ই দেখা যায় প্রস্টেট ক্যান্সারের রোগী ক্যান্সারের পরিবর্তে অন্য কোনো রোগে মারা গেছেন।

**২। প্রস্টেটের সংক্রমণ :** এটি দু' প্রকারের হয়— ব্যাকটেরিয়াল এবং নন-ব্যাকটেরিয়াল বা ক্রনিক পেলভিক পেইন সিনড্রোম। সালমোনেলা ফিকালিস, ই-কোলাই ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সংগ্রমণে মাঝবয়সী পুরুষদের (৩৫-৪০ বছর) ব্যাকটেরিয়াল প্রস্টেটাইটিস হয়। এক পুরুষের একাধিক সঙ্গিনী থাকলে, অনেকক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখলে, জল কম খেলে, বেশি মদ খেলে, অনেকক্ষণ গাড়ি চালালে এই রোগ হতে পারে।

অ্যাকিউট প্রস্টেটাইটিসে প্রস্রাবের সময় খুব জ্বালা-যন্ত্রণা ও তলপেটে ব্যথা হয়, বারবার প্রস্রাব হয়, জ্বর আসে, সিমেনে রক্ত আসতে পারে। এই সমস্যা তিন মাসের বেশি চললে যা বারবার হলে তাকে ক্রনিক ব্যাকটেরিয়াল প্রস্টেটাইটিস বলা হয়।

ব্যাকটেরিয়াল প্রস্টেটাইটিসের মতো লক্ষণযুক্ত কোনো রোগীর ইউরিন কালচার বা এক্সপ্রেসড প্রস্টেটিক সিক্রেশন কালচার করেও কোনো সংক্রমণ খুঁজে পাওয়া না গেলে তাকে ননব্যাকটেরিয়াল প্রস্টেটাইটিস বলা হয়। আসলে এটি একটি সাইকোসোমাটিক রোগ। যাঁরা সামাজিক, পারিবারিক বা কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত মানসিক চাপে থাকেন, তাঁদের এই অসুখ হতে পারে।

**হোমিপ্যাথিক প্রতিকার :** ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করার মতো পরিস্থিতি থাকলে (এক্ষেত্রে চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন) প্রস্টেটের যে কোনো সমস্যায় হোমিওপ্যাথি অমৃতসম কাজ করে। ক্যাথেটার ছাড়া প্রস্রাব করতে পারেন না, অথচ আর্থিক অসুবিধায় অপারেশনও করতে পারছেন না, এরকম বহু রোগীকে ধাতুগত ওষুধ ছাড়াও প্যারাইরা ব্র্যাভা, ফেরাম পিক্রিক, স্যাবাল সেরুলাটা, ডিজিটালিস ইত্যাদি ওষুধ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করে আশাতীত উপকার দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনেও কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, যেমন— রাত্রে জল কম খাওয়া, তলপেটের পেশীকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ ব্যায়াম ও ব্রিদিং এক্সারসাইজ, মূত্রত্যাগের সময় মানসিকভাবে রিল্যাক্স থাকা, মদ্যপান ও স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ বন্ধ করা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সতর্কতা ইত্যাদি।

তবে সর্বদাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ■

# হিন্দু শরণার্থীরা বুঝবেন, কে তাদের বন্ধু আর কে শত্রু

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

পূর্ণিমা শীল। আজ থেকে দশবছর আগে, পূর্ণিমা যখন তেরো বছরের এক কিশোরী, সেই সময় বাংলাদেশে পূর্ণিমার পরিবার আক্রান্ত হয়। আক্রমণের একটিই কারণ—পূর্ণিমারা ধর্মে হিন্দু। আক্রমণকারীরা পূর্ণিমার পিতা-মাতাকে মারধর করে পূর্ণিমাকে একটি ঘরে টেনে নিয়ে যায়, এবং সেখানে তাকে গণধর্ষণ করে। পূর্ণিমার অসহায় মা আক্রমণকারীদের পায়ে ধরে কাতর আবেদন করেছিলেন—'বাবা, আমার মেয়েটা বড্ড ছোট। তোমরা একসঙ্গে সবাই ওই ঘরে যেও না। ওর কষ্ট হবে। একজন একজন করে যাও।' কতটা অসহায় হলে একজন মা তার কন্যাসন্তানকে ধর্ষিতা হতে দেখে এরকম কাতর আকুতি করতে পারেন ভাবুন। সুদীপ অধিকারী। বাংলাদেশের বাগেরহাট থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন এপার বাঙ্গলায়। শুধুমাত্র হিন্দু—এই কারণে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সুদীপবাবু তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—'সেই রাতেই মৃত্যুদূতেরা সশস্ত্র হয়ে হানা দিল আমাদের বাড়িতে। লাথি মেরে দরজা ভেঙে টেনে বের করল বাবা মামা আর দাদাদের। রাইফেল উঁচিয়ে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকারে। আধো অন্ধকারে তাদের চেনা গেল—তারা আমাদের গ্রামের হাতেম আলি, রহমান মিঞা আর বাসাবাটির মওলানার মদতপুষ্ট এনায়েতের ভাই ছোট্টু। তাদের আরও দুই সঙ্গী বিষ্ণুপুর কলাগাছিয়ার দুই দুষ্কৃতী। মা মঞ্জুকে বুকে জড়িয়ে অন্ধকার ঠাকুর ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। মায়ের বুক থেকে ওরা হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল মঞ্জুকে। মা উপুর হয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল একজনের পা। চিৎকার করে উঠল—তোমাদের পায়ে পড়ি ওকে ছেড়ে দাও। একটা লাথি পড়ল মার মুখে। অন্ধকার রাত ভেদ করে 'বাঁচাও, ওমা আমাকে বাঁচাও' আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠল সারা গ্রাম। পুঁটিমারি নদীর তীর থেকে সে আর্তনাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। অন্ধকার রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে ছুটেও মা মঞ্জুকে বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারল না।'

তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য কী ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল। চল্লিশের দশকের গোড়াতেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবিতে মুসলিম লিগের আন্দোলন ক্রমশ চড়া আকার ধারণ করছিল। এবং সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নেমে আসছিল। দিন যত এগোচ্ছিল, এই আক্রমণের মাত্রাও তত চড়ছিল। তার চূড়ান্ত প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৪৬-এর আগস্টে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং ওই বছরই অক্টোবরে নোয়াখালির হিন্দু নিধনে। স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবিতে সরব হওয়া মুসলমান নেতারা পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পঞ্জাবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর

ভিতর তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমিতে হিন্দুদের যে কোনো অধিকারই থাকতে পারে না—এমনই ধারণা তৈরি করেছিলেন তারা। দ্বিজাতি তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা সৈয়দ আহমেদ খান লিখেছিলেন---'বাঙ্গালিদের নেতৃত্ব আমাদের মানলে চলবে না। কোরানের নির্দেশ মতো আমরা স্বতন্ত্র পথে চলব।' 'বাঙ্গালি' বলতে সৈয়দ আহমেদ খান পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদেরই বুঝিয়েছিলেন। এসব ছাড়াও সর্বোপরি ছিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং মুসলিম লিগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের হুংকার। ১৯৪৬-এর আগস্টে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের প্রাক্কালে সমগ্র কলকাতা শহর একটি পোস্টারে ছয়লাপ করে দেওয়া হয়েছিল। ওই পোস্টারে জিন্নাহর একটি তরবারি হাতে ছবির তলায় লেখা ছিল---'কাফেরগণ, তোমাদের শেষ দিন সমাসন্ন। এখানে আবার মুসলমানের ন্যায়দণ্ড প্রতিষ্ঠা হবে।' ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং নোয়াখালির দাঙ্গার পরই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল সমগ্র পঞ্জাব এবং বাংলা যদি জিন্নাহর দাবি মতো পাকিস্তানে চলে যায়, তাহলে ওই দুই প্রদেশে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু-শিখদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। তড়িঘড়ি স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা অবশ্য ওই দুই প্রদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু এবং শিখদের ভবিতব্যটি বিবেচনার মধ্যে আনতেই চাননি। কংগ্রেস নেতা সি রাজাগোপালাচারি দেশ বিভাজন সংক্রান্ত যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তাতে স্পষ্টই বলা ছিল—সমগ্র পঞ্জাব এবং বাঙ্গলাকে পাকিস্তানে দিয়ে দেওয়া হোক। রাজাগোপালাচারি এও বলেছিলেন, পঞ্জাব এবং বাঙ্গলা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বড় অন্তরায়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের দুর্ভাগ্য যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই রাজাগোপালাচারিই এই রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল হয়ে এসেছিলেন। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন—'আমাদের এখন বয়স হয়ে গেছে, আর দীর্ঘ আন্দোলন করার মতো ক্ষমতাও আমাদের নেই। কাজেই তখন একটা সমঝোতায় আসার দরকার ছিল।' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলেছিলেন—'আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশভাগ হবে।' দেশ কিন্তু ভাগ হলো গান্ধীর জীবিতাবস্থাতেই। গান্ধী বললেন—'আমার এখন মৌনতা পালনের সময়।' এ প্রসঙ্গে নেহরু অবশ্য পরে বলেছিলেন—'মহাত্মা যদি একবার মুখ ফুটে বলতেন তিনি দেশভাগ চান না, এবং আমাদের আরও আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলতেন, তাহলে আমরা আন্দোলন করতাম।' সমগ্র পঞ্জাব এবং সমগ্র বাঙ্গলা ইচ্ছা থাকলেও জিন্নাহ নিতে পারেননি।

ওই দুই প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অংশ ভারতে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬-এ মুসলিম লিগের হিন্দু নিধন প্রত্যক্ষ করে দুই ব্যক্তিত্ব বুঝেছিলেন, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম পঞ্জাবে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু-শিখরা থেকে যাবেন, তাদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ নেমে আসতে বাধ্য। এই দুই ব্যক্তিত্ব হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর। বলতে গেলে, ১৯৪০-এর গোড়া থেকেই পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা দেখে শ্যামাপ্রসাদ ক্রমশ শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন, সমগ্র বাংলা যদি জিন্নাহ এবং মুসলিম লিগের কবলে চলে যায়, তাহলে সমগ্র হিন্দু জাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কাজেই অখণ্ড বাঙ্গলার পশ্চিম অংশ, যেটি হিন্দুপ্রধান তাকে ভারতে রাখতে তৎপর হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন তিনি। শ্যামাপ্রসাদ এবং আম্বেদকর, দুজনেই নেহরুর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারত এবং পাকিস্তানের ভিতর সংখ্যালঘু বিনিময় হোক। সে প্রস্তাব নেহরু মানেননি। নেহরুর সেই মনোভাবকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন 'দুরপনেয় কলঙ্ক।' যদি নেহরু সেদিন শ্যামাপ্রসাদ এবং আম্বেদকরের সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাবটি মেনে নিতেন, তাহলে আজ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা নাগরিক পঞ্জিকরণের প্রশ্নই উঠত না ভারতে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দুরা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। ১৯৪৭, ১৯৫০ এবং ১৯৭১ সালে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সবকিছু খুইয়ে একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এতেই শেষ নয়। শরণার্থীর ঢল কম-বেশি সবসময়ই লেগে থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম হলেও হিন্দুদের উপর আক্রমণ বন্ধ হয়নি। ফলে সরকারি তথ্য পরিসংখ্যানেই দেখা যাবে, প্রতি বছরই কমবেশি হিন্দু শরণার্থী এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এরা কেউ পর্যটকের মতো এদেশে আসেননি। ভিসা পাসপোর্ট নিয়েও এদেশে আসেননি। নিজের স্ত্রী-কন্যাকে চোখের সামনে ধর্ষিতা হতে দেখে, নিজের জীবিকা এবং সম্পত্তি হারিয়ে প্রাণভয়ে এদেশে এসে আশ্রয়

নিয়েছে। একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে এক কোটিরও বেশি হিন্দুর কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না বাংলাদেশে। এদের অনেককেই বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। অনেককে খুন করা হয়েছে। অনেকে পালিয়ে গেছেন। আসলে এরা বরাবরই ভেবে এসেছে, ভারতই তাদের প্রকৃত আশ্রয়দাতা। কারণটা আর অন্য কিছুই নয়। ভারত রাষ্ট্রটিকে ভাগ করা হয়েছিল ধর্মের ভীত্তিতে। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি যখন পাকিস্তান হয়েছিল, তখন পরোক্ষে এটাও স্বীকৃত হয়েছিল ভারত হিন্দুদের আবাসভূমি। সে কারণেই অত্যাচারিত হিন্দুরা বারবার ভারতেই আশ্রয় চেয়েছে। এই চাওয়ার ভিতর কোথাও কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু ভারত রাষ্ট্র এতদিন এদের প্রতি কী আচরণ করেছে? সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছে কি এদের? প্রথম ভুলটি হয়েছিল দেশভাগের সময়। স্বাধীনতার স্বপ্নে মশগুল নেতারা এই হতভাগ্য হিন্দুদের কাছে জানতেই চাননি তারা কোন দেশের নাগরিকত্ব চান? হিন্দু প্রধান ভারতের, না জিন্নাহর ইসলামি দেশ পাকিস্তানের? এই হতভাগ্য মানুষগুলি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন, তারা একটি ইসলামিক দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বনে গেছেন। সাত দশকে ভারত সরকারও কিন্তু এই মানুষগুলির প্রতি। কোনোরকম মানবিক আচরণ করেনি। অথচ ভারত রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল এই অসহায় হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করা। তা না করে, সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে এই অসহায় শরণার্থীদের গুলি করে মেরেছে রাষ্ট্র।

হিন্দু শরণার্থীরা আজ সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকবেন দুই গুজরাতি ভদ্রলোক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এবং অমিত শাহের প্রতি যে কর্তব্য কেউ কোনোদিন পালন করেনি, সেই কর্তব্যই এঁরা দুজন পালন করলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই ছিল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আসা নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এদেশে আশ্রয় দেওয়া হবে এবং নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। ২০১৫ সালে নরেন্দ্র মোদীর সরকার ফরেনার রেজিস্ট্রেশন আইন এবং পাসপোর্ট আইনে কিছু পরিবর্তন আনে। তাতে বলা হয়, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগত ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এদেশে শরণার্থীর মর্যাদা পাবেন। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই যে এদের এদেশ থেকে বহিষ্কার করা যাবে না—সেটি আইনত পাকাপোক্ত করে দেওয়া হলো। এরই পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারকেও একটি বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেটি কীরকম? নরেন্দ্র মোদীই হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি বাংলাদেশ সফরে গিয়ে ওখানকার হিন্দুদের অনত্যম ধর্মীয় স্থান ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেন। এবং খান সেনাদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়া বাংলাদেশের অন্যতম হিন্দু মন্দির রমনা কালীবাড়ির সংস্কারকল্পে অর্থমঞ্জুর করেন। এই দুটি কাজের মাধ্যমে একটি পরিষ্কার বার্তা তিনি বাংলাদেশকে দিয়েছিলেন। বার্তাটি হলো---সে দেশের হিন্দুদের পাশে ভারত রাষ্ট্র রয়েছে। এবং অবশেষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনে এই হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করলেন। একথা বলতেই হয়, এই অত্যাচারিত, নিপীড়িত, সর্বস্ব খোয়ানো হিন্দু শরণার্থীদের চোখের জলের মূল্য নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ যথার্থ বুঝতে পেরেছেন। এরপর থেকে হিন্দু শরণার্থীরাও ভরসা রাখবেন এই দুই গুজরাতির উপর।

অন্যদিকে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের ভূমিকা কী? বামপন্থীরা অবশ্য দেশভাগের সময়ই পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থক ছিল। আওয়াজ তুলেছিল, 'আগে পাকিস্তান দিতে হবে, পরে ভারত স্বাধীন হবে।' কংগ্রেস দেশভাগের সময় তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দুর আর্তনাদ উপলব্ধি করার প্রয়োজনই বোধ করেনি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালি প্রেমের অন্তরালে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পাকাপাকি বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে চাইছেন এই পশ্চিমবঙ্গে। এরা সকলে হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ঠেকাতে এখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করতে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। এরা অভিযোগ করছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপূর্ণ। এতে মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদানের কোনো কথাই বলা হয়নি। বরং মুসলমানাদের এই দেশ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদের এইসব অভিযোগের জবাবে বলা যেতে পারে, প্রথমত এই বিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা নেই। বরং এই বিলে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যে অধিকার দেওয়া আছে, তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। এই বিলে আরো বলা আছে, হিন্দু, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাইরেও অন্য দেশে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত কোনো ব্যক্তি যদি এ দেশের নাগরিকত্ব চায়, তা বিবেচনা করে দেখা হবে। দ্বিতীয়ত এই বিলটি শুধুমাত্র শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষেই তৈরি করা হয়েছে। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা এই অপপ্রচার যখন চালাচ্ছে, তখন খুব চতুরতার সঙ্গে তারা রাষ্ট্রসংঘ প্রদত্ত শরণার্থীর সংজ্ঞাটিকে চেপে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ পরিষ্কার বলেছে—কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি নিজ দেশে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত অত্যাচারিত হয়ে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করে অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নেয় তবেই সে শরণার্থী। এই সংজ্ঞায় কিন্তু মুসলমানরা গণ্য হন না। পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আসেননি। তারা অন্য কোনো কারণে এসে থাকতে পারেন। আসলে এদের শঙ্কাটা অন্য জায়গায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কার্যকরী হলে এদের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি লাটে উঠবে। এদের বাঙ্গালি দরদি মুখোশটি খসে গিয়ে এবার হিন্দু বিরোধী মুখটি প্রকাশ্যে আসবে।

হিন্দু শরণার্থীরা এখন বুঝতে পারছেন কে তাদের বন্ধু, আর বন্ধুর ছদ্মবেশে কে তাদের শত্রু। কে তাদের এতদিন প্রতারণা করে এসেছে। প্রতারকদের সমুচিত শিক্ষা দেবেন সব হারিয়ে এই বাংলায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীরা। ■

# হিন্দু শরণার্থীকে আর শাসক দলের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে না

**সুব্রত ভৌমিক**

পশ্চিমবঙ্গে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার আশা বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীরা সম্ভবত ছেড়েই দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর (ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমা) যেসব হিন্দু বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। প্রতি পদক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের নেতা-কর্মীদের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর তাদের নির্ভর করতে হতো। নেতা-কর্মীরাও সুযোগ বুঝে তাদের ব্ল্যাকমেল করতেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯ সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ায় তারা নিশ্চিতভাবে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। তাদের অনেকদিনের আশা এবার পূর্ণ হবে। কিন্তু বিলটির প্রেক্ষাপট এবং খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনেকেই এখনও ঠিকমতো অবগত নন। এই নিবন্ধে আমরা বিলটি সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদানপ্রদানের চেষ্টা করব।

**হিন্দু উদ্বাস্তু বা শরণার্থী এবং বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য :**

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক দপ্তর 'ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন অব রিফিউজিস' (UNHCR) ১৯৪১ সালের জেনেভা কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের উরুগুয়ে প্রটোকল অনুসারে **উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর সংজ্ঞা ঃ "যদি কোনও দেশের কোনও মানুষ জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্রীয়তা, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনও বিশেষ দলের সদস্য হওয়ার জন্য নিজের দেশে অত্যাচারিত হন এবং গভীর ভয়ের জন্য দেশে ফিরতে না চান, তবে ওই মানুষটি দ্বিতীয় বা আশ্রয়দাতা দেশে উদ্বাস্তু বা শরণার্থী হিসেবে গণ্য হবেন।"**

সেই কারণে ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য বাংলাদেশে উচ্চবর্ণ/নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে নির্যাতিত হয়ে ভারতে আসা প্রত্যেক হিন্দুই শরণার্থী বা উদ্বাস্তু। কিন্তু ভারতকে কর্মসংস্থান ও ব্যবসার বিরাট বাজার মনে করে যেসব বাংলাদেশি মুসলমান অবৈধভাবে ভারতে এসেছে তারা সবাই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী। তাই 'অনুপ্রবেশকারী' শব্দ মাত্রই স্পষ্টভাবে ভারতে প্রধানত বেআইনিভাবে প্রবেশ করা মুসলমানদের বুঝতে হবে।

**আপনারা কখনও ভেবে দেখেছেন কি?**

১। দেশভাগের যোজনা অনুযায়ী ১৯ শতাংশ মুসলমানদের জন্য ২৩ শতাংশ জমি দেওয়া হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-সহ আরও অনেকের সম্পূর্ণ সংখ্যালঘু বিনিময়ের প্রস্তাব নেহরু অগ্রাহ্য করেন।

২। পরিণামে, হিন্দুদের উদারতায় অধিকাংশ মুসলমান ভারতে থেকে যায় দেশভাগের পর যেসব মুসলমান পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদিত হবার পর তারা আবার ফিরে আসেন। কিন্তু পাকিস্তানে ধারাবাহিক নির্যাতনের ফলে হিন্দুরা বিতাড়িত হতে হতে পাকিস্তান প্রায় হিন্দুশূন্য হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানেও বিতাড়ন চলতে থাকে।

৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেওয়ার সময় ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর ভারতে বাংলাদেশ থেকে কোনো হিন্দু আসবেন না এই মর্মে মুজিবের সঙ্গে চুক্তি করেন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যাতে একজনও হিন্দুকে নির্যাতিত হয়ে ভারতে আসতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সক্রিয় ও আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশের উপর কোনও ধারাবাহিক চাপ বজায় রাখেনি। ফলে বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হিন্দুর শরণার্থী হয়ে ভারতে আসা বন্ধ হয়নি। পরিণামে, হিন্দুর সংখ্যা সেখানে ১৯৫১ সালে ছিল ২২ শতাংশ, ২০১১ সালে তা কমে ৮.৫ শতাংশ হয়েছে। এর বিপরীতে, ১৯৪৭ সালে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৯.৮ শতাংশ, ২০১১ সালে তা বেড়ে ১৪.২ শতাংশ হয়েছে। এই একই সময়ে হিন্দু জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশ থেকে কমে ৭৯.৮ শতাংশ হয়েছে।

৪। এই বাড়তি হিন্দু শরণার্থীর চাপ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরাকে নিতে হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে পরিকল্পিতভাবে ভারতে আসা বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের চাপ।

৫। কেন্দ্রের কংগ্রেস এবং এই তিনটি রাজ্যের রাজ্য সরকারগুলি একদিকে হিন্দু বাঙ্গালি শরণার্থী/উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের বিষয়ে কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে কেন্দ্রের কংগ্রেস

সরকার বরাবর নীরব থেকেছে; অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশ বন্ধ করারও কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

৬। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং বর্তমান রাজ্য সরকার হিন্দু শরণার্থীদের স্থায়ী নাগরিকত্বের বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে তদ্বির করেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে আসা বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় বন্ধে কোনও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

৭। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার অবস্থার বিপাকে শরণার্থী হয়ে আসা বাঙ্গালি হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেয়, যে দণ্ডকারণ্য স্বাধীনতার এত বছর পরেও কৃষি-শিল্প কর্মসংস্থান-আর্থিক উন্নতি সব দিক থেকে এতটাই পিছিয়ে যে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেখানে মাওবাদীদের ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ অসহায় হিন্দু শরণার্থীরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অবহেলা ও অবিচারের শিকার হয়েছে। সেখানকার স্থানীয় মানুষদেরই যখন এই দুরবস্থা তখন ছিন্নমূল বাঙ্গালি হিন্দুরা সেখানে গিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছুই করতে পারত না বা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে অথৈ জলে পড়তো এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

৮। এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় সরকার আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত মূলত হিন্দু শরণার্থীদের স্থায়ী নাগরিকত্ব প্রদানে উদ্যোগী হয়ে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' পাশ করল। এর জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য কোনও ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

হিন্দু শরণার্থী ও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংশয় আশঙ্কা ও বিভ্রান্তি দূর করে কেন্দ্র সরকার সংশোধনীতে স্পষ্টভাবে বলেছে যে :—

**আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসি-খ্রিস্টান যাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার পাসপোর্ট আইন ১৯২০-র ধারা ৩ এর উপধারা (২) অনুসারে অথবা ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ প্রযুক্ত হওয়া থেকে ছাড় দিয়েছে, তারা এই আইনের (নাগরিকত্ব আইন) জন্য 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে বিবেচিত হবেন না।**

৯। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিতে উল্লিখিত যে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ তারিখটি পরবর্তী সময়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটির পরিবর্তে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আগত সমস্ত হিন্দু শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার শুভ উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

১০। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় শরণার্থী/উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। তারা দেশভাগের আগে থেকে ভারতে থাকা নাগরিকদের মতোই আত্মমর্যাদা ও স্বাভিমানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে এদেশে বসবাস করবেন। হিন্দু শরণার্থী ও বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোনও জটিলতা বা ধোঁয়াশা থাকবে না। ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো তো দূরের কথা, বরং এর ফলে কোনও অসাধু আধিকারিক অনুপ্রবেশকারীর তকমা লাগিয়ে কোনও হিন্দু শরণার্থীকে হেনস্তা করতে পারবেন না।

১১। এনআরসি অনেক দূরের ব্যাপার। প্রথমে নাগরিকত্ব সংশোধনীর মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ভারতে আসা সমস্ত হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করা হবে। তারপর এনআরসি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

১২। নাগরিকত্ব প্রমাণে কোনও নথিপত্রের প্রয়োজন নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং লোকসভায় বলেছেন রেশন কার্ড থাকুক বা না থাকুক কোনও সমস্যা নেই। যে হিন্দু শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তারাই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১৩। অবৈধভাবে থাকার জন্য কারও বিরুদ্ধে চালু মামলাও নতুন আইন অনুযায়ী সেই ব্যক্তি নাগরিকত্ব পেলে বাতিল হয়ে যাবে। এমনকী যে শরণার্থীরা অবৈধভাবে থাকার সময়কালে জমি বাড়ি কিনেছেন, বা চাকরি করছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

সুতরাং এককথায় বলা যায় যে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' হচ্ছে বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের সুরক্ষাকবচ। বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের এ দেশ থেকে তাড়ানো বা ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার জন্য নয়, বরং যাতে আবার অসমের মতো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয় তার জন্য একটি স্থায়ী, শুভ ও মহৎ উদ্যোগ।

অথচ বিগত কিছুদিন ধরে এনআরসি-নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি অস্মিতার ঢেউ উঠেছে। বাঙ্গালিদের না কি দলে দলে এদেশ থেকে তাড়ানো হবে—এই বলে স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী,

ক্ষুদ্র ও দলীয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল, নেতা সহজ সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ব্যস্ত। অধিকাংশ সংবাদপত্রে এই মর্মে উত্তর সম্পাদকীয় ও ওয়েব পোর্টালে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। যারা নাগরিকত্ব সংশোধনী-র স্বপক্ষে তারা বাঙ্গালি বিরোধী এই মর্মে আলোচনা চক্র আয়োজিত হচ্ছে। এ সবের আসল উদ্দেশ্য কী?

১। এ সব রাজনৈতিক দল ও নেতাদের উদ্দেশ্য হলো, বাঙ্গালি আবেগের আড়ালে হিন্দু বাঙ্গালি শরণার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশি বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের একই গোত্রভুক্ত করে তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া। ভারতের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, জন বিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট করে; ভারতীয় নাগরিকদের সরকারি সুযোগ সুবিধা, কর্মসংস্থানে ভাগ বসানোর ব্যবস্থা করার বিনিময়ে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাদের ভোটে জিতে নিজেদের দলীয় ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে চরিতার্থ করা, দীর্ঘদিন ক্ষমতার মধু চেটেপুটে খাওয়া।

২। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১-এর ২৪ মার্চের পর ভারতে আসা হিন্দু শরণার্থীদেরকেও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রূপে গণ্য করার অধিকার প্রশাসনের ছিল। শাসক দল (পূর্বতন ও বর্তমান) এই অধিকার নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি পদে পদে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা রেশন কার্ড, সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তিসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা সবই পাবে কিন্তু শর্ত একটাই, তাদেরকে সবসময় শাসকদলের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে। সংশোধনী আইনে পরিণত হওয়ায় বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীরা স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন এবং তারা আর শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদার হয়ে থাকতে বাধ্য হবেন না। কারণ, নাগরিক হিসাবে সমস্ত রকমের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু শরণার্থীদের আর শাসকগোষ্ঠীর শরণাপন্ন হতে হবে না। এবং সেই সুযোগে ১৯৭১ এর ২৪ মার্চের অজুহাতে রেশন কার্ড, বি পি এল কার্ড, আই কার্ড, আধার কার্ড এবং জমির পাট্টা ও জমি বাড়ি কেনা সহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে আর ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না। হিন্দু শরণার্থীরা স্বাধীনভাবে রাজ্য ও দেশের স্বার্থে তাদের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন না রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অন্য কোনও দলের মিটিং মিছিলে যোগ দিলে তাদের আর শাসকগোষ্ঠী সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এর জন্যই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ও পূর্বতন শাসকগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মিটিং-মিছিল বা ব্রিগেড ভরানোর জন্য কিংবা অন্য দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এসব অসহায় হিন্দু শরণার্থীদের ব্যবহার করে আসছে, তারা সে সুযোগ হারাল। তাই তারা ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ তারিখটির আইনি বৈধতা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বজায় রাখতে চাইছিল যাতে হিন্দুরা ওপার বাংলায় আওয়ামি লিগ বা বি এন পি-র দলদাস আর অত্যাচারিত হয়ে শাসকগোষ্ঠীর দলদাস হয়ে থাকতে বাধ্য হন। এরকম অবস্থায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় হিন্দু শরণার্থীদের ব্ল্যাকমেল করার প্রধান অস্ত্রটাই তাদের হাতছাড়া হল। তাই যে কোনও মূল্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ঠেকাতে তারা এ জন্যই এত মরিয়া ছিল।

৩। বাঙ্গালিয়ানার জিগির তোলা স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা কল্পনার ফানুস আকাশে উড়িয়ে বলে চলেছেন যে, 'এনআরসি রুখতে হবে' না হলে বাঙ্গালির অবস্থা রোহিঙ্গাদের মতো হবে। নাৎসিদের ইহুদি নির্যাতন, প্যালেস্তিনীয়দের দুরবস্থা ইত্যাদির গল্প বলে এন আর সি জুজুর বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের জন্য এদের চোখে জল কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু নির্যাতন, কাশ্মীরে হিন্দু পন্ডিতদের উপর নির্যাতন এদের চোখে পড়ে না তাই চোখে জল, আসে না। হিন্দু শরণার্থীদের দুরবস্থা, ২৪ মার্চ ১৯৭১-এর পরে আসা হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ইত্যাদি নিয়ে লেখার সময় এদের কলমের কালি, চোখের জল শুকিয়ে যায়। বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্বের পক্ষে বাধা স্বরূপ ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ তারিখটি বাতিলের জন্য এদের কলম এখনও গর্জে ওঠেনি।

৪। এই বাঙ্গালিত্বের জিগির তোলা বুদ্ধিজীবীরা আসলে না বাঙ্গালি, না হিন্দু, না ভারতীয়। এরা আদ্যপ্রান্ত পেশাজীবী। এদের একমাত্র লক্ষ্য হলো অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। এদের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, কবিতা সবই বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক। বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কথা না বলে আসলে এরা দুই বঙ্গেরই বাংলাভাষী মুসলমানদের (বাঙ্গালি নয়, অবশ্য অতি নগণ্য কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে।) মন জয় করতে চায় যাতে এদের সাহিত্য, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র, নাটকের পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক বাড়ে এবং তদের উপার্জন ও প্রতিষ্ঠাও বাড়ে।

৫। শুধু তাই নয়, এরা বলছেন যে বাঙ্গালি হিন্দু শুধু বাঙ্গালিয়ানার গর্ব করবে হিন্দুয়ানির নয়, কারণ হিন্দুয়ানি হলো সাম্প্রদায়িক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''হিন্দু শব্দে ও মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বোঝায় না। মুসলমান একটি ধর্ম। কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নয়। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।'' স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এখানে ধর্ম বলতে ইংরেজি রিলিজিয়ন বা নির্দিষ্ট উপাসনা ভিত্তিক সম্প্রদায়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তার মতে মুসলমান একটি সম্প্রদায় হিন্দু কোনও সম্প্রদায় নয়। হিন্দু যখন সম্প্রদায়ই নয় তখন তা সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। তাই বাঙ্গালি হিন্দু বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে হিন্দুর এই জাতিগত অস্মিতা নিয়ে অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারে। এর মধ্যে যদি কেউ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খোঁজেন তবে করুণাময় ঈশ্বর তাকে সুবিদ্ধ দিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের থেকেও স্বঘোষিত বড়ো পণ্ডিতরা বলছেন যে হিন্দুত্ব নয়, বাঙ্গালি হিন্দুর বাঙ্গালিয়ানা নিয়ে গর্ব করা উচিত। কারণ হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িক আর যারা হিন্দুত্বের কথা বলে তারা আসলে বাঙ্গালি বিরোধী এবং বাঙ্গালিদের উপর জোর করে হিন্দি ও হিন্দুত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। এবং পশ্চিমবঙ্গে যারা হিন্দুত্বের কথা বলে তারা আসলে সেই বাঙ্গালি বিরোধীদের চাটুকার। অথচ এই সরল সত্যটি স্বীকার করার সৎ সাহস এদের নেই যে, সাধারণ বাঙ্গালি হিন্দু এই অতি পণ্ডিতদের মুখে ছাই দিয়ে তার 'বাঙ্গালিত্ব'-র সঙ্গে 'হিন্দুত্ব' নিয়েও সমানভাবে গর্বিত। সেজন্য তারা হিন্দুত্ব বজায় রাখতেই পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হয়ে ভারতে এসেছেন। না হলে তো তারা নিজেদের হিন্দু সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও পরম্পরা হারিয়ে শুধু বাংলাভাষী মুসলমান হয়েই বাংলাদেশে থাকতে পারতেন।

কল্পনাপ্রবণ হয়ে এভাবে যাদের পছন্দ নয় তাদের ফ্যাসিবাদী, নাৎসি, বাঙ্গালি বিরোধী ইত্যাদি মনগড়া তকমা লাগিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার মাত্র।

এই ক্ষুদ্র, নীচ, দলীয় ও ব্যক্তিগত নিহিত স্বার্থের জন্যই এক দিকে যেমন বামফ্রন্টের এক

কুখ্যাত মন্ত্রী মহারাষ্ট্র থেকে ধরে আনা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের, ট্রেন থামিয়ে মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, অন্য দিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী বিতারণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

সব শেষে যারা এত বাঙ্গালি অস্মিতার ধুয়ো তুলেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিনীত প্রশ্ন—

(ক) যদি 'বাঙ্গালি' পরিচয়ই হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিত্তি হয়, তাহলে কয়েক কোটি বাঙ্গালি হিন্দু বাঙ্গালি পরিচয়ের গর্ব নিয়ে বাংলাদেশে কেন থাকতে পারলেন না? শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে কেন তাদের উদ্বাস্তু বা শরণার্থী হয়ে ভারতে আসতে হলো?

(খ) ২০১০ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সে দেশের 'স্টেট রিলিজিয়ন' রূপে ইসলামের মর্যাদাকে পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়াও, ১৯৭৭ ও ১৯৭৭-তে সংবিধানে যুক্ত হওয়া যথাক্রমে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস ও আনুগত্য' এবং 'বিসমিল্লাহ-অর-রহমান-অর রহিম' অর্থাৎ 'পরম করুণাময়, পরহিতকারী আল্লাহর নামে'--এই বিশেষ শব্দগুলিকেও বলবৎ রেখেছে। বৃহত্তর বাঙ্গালি ভাবনার পরিপন্থী এবং সংকীর্ণ ইসলামি চিন্তার পরিচায়ক এসব সিদ্ধান্তের জন্য এই অতি পণ্ডিতরা কিন্তু কখনোই গেল গেল রব তোলেননি। এর ফলে ইসলামি ধর্মান্ধতা বেড়েছে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় সেখান থেকে হিন্দুদের শরণার্থী হয়ে ভারতে আসা বন্ধ হয়নি। এ ব্যাপারে তাদের কলম বন্ধ্যা কেন?

(গ) বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছেন। অসমের বুকে চীন, আই এস আই মদতপুষ্ট আলফা জঙ্গিদের দ্বারা সংঘটিত কয়েকটি নারকীয় হিংসাত্মক ঘটনা ছাড়া বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের কোনও অবাঙ্গালি অধ্যুষিত রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যিনি নিজে উদ্বাস্তু হয়েও মরিচঝাঁপিতে কয়েক হাজার বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীকে নেড়ি কুকুরের মতো গুলি করে কুমির, কামটের মুখে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি কি বাঙ্গালি পদবাচ্য? নাকি তিনি অবাঙ্গালি ছিলেন?

**আমাদের কী করণীয়**

১। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রত্যেকটি হিন্দু

**কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল প্রত্যেক হিন্দু শরণার্থীদের ভোটার হিসাবে ব্যবহার করেছে কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কোন উদ্যোগই নেয়নি।**

শরণার্থী/উদ্বাস্তু পরিবারকে সহজ, সরল ও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে—

(ক) বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থী/উদ্বাস্তু ও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য।

(খ) নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় শরণার্থী/উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। কোনও জটিলতা বা ধোঁয়াশা থাকবে না। এর ফলে কোনও অসাধু আধিকারিক বা শাকস দল অনুপ্রবেশকারীর তকমা লাগিয়ে কোনও হিন্দু শরণার্থীকে হেনস্তা বা ব্ল্যাকমেল করতে পারবেন না।

(গ) এন আর সি অনেক দূরের ব্যাপার। প্রথমে নাগরিকত্ব সংশোধনীর মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ভারতে আসা সমস্ত হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করা হবে। তারপর এন আর সি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

(ঘ) নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বিশেষভাবে নাগরিকত্বের প্রশ্নে ১৯৭১-এর ২৪ মার্চ তারিখের আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না, কোনও নথিপত্র লাগবে না ইত্যাদি।

(চ) কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল প্রত্যেক হিন্দু শরণার্থীদের ভোটার হিসাবে ব্যবহার করেছে কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কোনই উদ্যোগ নেয়নি।

(ছ) উপরে আলোচিত নাগরিকত্ব সংশোধনী-র বিরোধিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত (২) ও (৪) নম্বর বিন্দুর বিষয়টি সকলকে বিশেষভাবে বোঝানো যাতে তাদের এতদিনের ভুল ধারণা ভেঙে যায়।

২। তাই যে সব রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী, বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের একই গোত্রভুক্ত করে বাঙ্গালি বাঙ্গালি বলে চেঁচিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনমত গড়ে তুলে তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করুন।

৩। নিজেরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন এবং অন্যকে সচেতন করুন যাতে এরাজ্যের অসাধু আধিকারিকরা (বিশেষভাবে ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর-এর) অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে একজনও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে বৈধ নথিপত্র তৈরি করে দিতে না পারে।

৪। কোনও রাজনৈতিক দলের কেউ তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে আসলে বা ভয় দেখালে তারা যেন দাপটের সঙ্গে বলেন যে, তারা যদি সত্যিই হিন্দু বাঙ্গালি শরণার্থী বা উদ্বাস্তু প্রেমী হয়, তবে তারা লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের যা বিরোধিতা করার করেছে কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের যে শুভ উদ্যোগ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে সহযোগিতা করে এবং ভবিষ্যতে যেন এন আর সি-র বিরোধিতা না করে।

# ছেচল্লিশের কালো ছায়া আবার পশ্চিমবঙ্গে

**মোহিত রায়**

নাগরিক সংশোধনী বিল এখন আইন। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। উদ্বাস্তুদের এই আইনি নাগরিকত্বের দাবি দীর্ঘদিনের, চার দশকের পুরানো দাবি। নাগরিক সংশোধনী আইনের ফলে বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা নাগরিক হয়ে গেলে বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানদের বেআইনি চিহ্নিত করতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস নাগরিক সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী, তলোয়ার, হিংসা, লুণ্ঠনের জোরেই ইসলামের প্রসার হয়েছিল দ্রুত। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা কেবলমাত্র তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ভরসা রাখতে পারে না। ফলে গত ১৩ ডিসেম্বর জুম্মাবার থেকে তারা শুরু করেছে একেবারে ১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গার পুনরাভিনয়। একেবারে পরিকল্পনা মাফিক না হলে একই দিনে, প্রায় একই সময়ে পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ, উলুবেড়িয়া, বেলডাঙ্গা, গার্ডেনরিচ, নিউটাউন, ধর্মতলা, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ— আরও অনেক স্থানে একই ধরনের সহিংস বিক্ষোভ ঘটা সম্ভব নয়। ঠিক যেরকম ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬, জুম্মাবার মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র নামে কলকতায় দাঙ্গা শুরু করে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ঘোষণায় জিন্না বলেছিলেন যে এতদিন ব্রিটিশ মেশিনগান ও কংগ্রেস অসহযোগের অস্ত্র দিয়ে আমাদের শাসিয়েছে। এবার আমাদের হাতেও আছে পিস্তল এবং আমরা তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত। ১৩ ডিসেম্বরের শুক্রবারের সহিংস বিক্ষোভের ছবি টেলিভিশনে ও পরের দিনের কাগজে সবাই দেখেছেন। সেই লুঙ্গি-টুপি পরিহিত হাজার হাজার মানুষ কোথাও আগুন লাগাচ্ছে, কোথাও ট্রেন আটকে আস্ফালন করছে, কিছুক্ষণ অবরোধ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলে যাওয়া— এসব নিরামিষ ব্যাপার নয়। জানিয়ে দেওয়া হলো— হাতে পিস্তল আছে। কোনো সংগঠন এর দায় নিচ্ছে না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসব ঘটনার কোনো নিন্দা করেননি, বরং তিনি হুমকি দিয়েছেন তিনিও পথে নামছেন।

১৬ আগস্ট ৪৬-এর দাবি ছিল মুসলমানদের জন্য হোমল্যান্ড পাকিস্তান গঠনের। আর তার জন্য সহিংস আক্রমণ। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯-এর দাবিও পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান বানানোর ও তার জন্য সহিংস আক্রমণ। এই আক্রমণের পরোক্ষ সমর্থনে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ও পেশী শক্তি এখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল ও তা ধরে রাখার প্রধান চাবিকাঠি। সুতরাং ১৩ ডিসেম্বরের ডাইরেক্ট অ্যাকশন পাকিস্তান তৈরির আন্দোলনে আবার ১৯৪৬ ফিরে এসেছে।

১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে সরকার থেকে দাঙ্গাকারীদের লরি পেট্রোল, কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি ১৬ আগস্ট নিজে লালবাজার কন্ট্রোল রুমে বসে থেকে পুলিশ যাতে কিছু না করে তা দেখতে থাকেন। নির্বিবাদে চলে হত্যা লুণ্ঠন। মৌলানা আজাদ বা ফজলুল হক, দুজনেই দাঙ্গার জন্য লিগ সরকারকে দায়ী করেন। বাঙ্গলার আইনসভায় (বিধানসভা) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সুরাবর্দিকে প্রশ্ন করেন— কেন সেদিন তিনি শহরটিকে গুন্ডা, অপহরণকারী ও লুণ্ঠনকারীদের হাতে তুলে দিলেন? সুরাবর্দির বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে লুণ্ঠনকারীদের ছাড়িয়ে আনার অভিযোগ ছিল। শ্যামাপ্রসাদ সুরাবর্দিকে আইনসভায় বলেছিলেন 'গুন্ডার সর্দার'। আজকের পশ্চিমবঙ্গে 'গুন্ডার সর্দার' কে?

অনেকটা আজকের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না! ঠিক যেরকম ২০০৭ সালে মধ্য কলকাতায় ইসলামি মৌলবাদী গুন্ডারা তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের দাবিতে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ভাঙচুর, লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ দিনভর চালিয়ে গেল, কমিউনিস্ট বুদ্ধিবীজী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিছুই করলেন না, পরে মিলিটারি এল। ২০১০-তে দেগঙ্গায় ইসলামি মৌলবাদী গুন্ডারা ভাঙচুর, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ চালালেও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর পুলিশ কিছুই করেনি। এরপর তৃণমূল। ২০১৭-এত কলকাতার পাশেই ভাঙড়ে এক সম্প্রদায়ের মানুষ ১০টি পুলিশ ভ্যান জ্বালিয়ে বা পুকুরে ফেলে পুলিশ পেটালেও পুলিশ কিচ্ছু করেনি। কালিয়াচকে হাজার হাজার ইসলামি মৌলবাদী থানা জ্বালিয়ে দিলেও কিছু করা হয় না। আর ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯, আবার টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ভাঙচুর, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ চলল দিনভর। পুলিশ দেখা যায়নি।

কিন্তু ১৯৪৬ সালের কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে একতরফা সফল হয়নি। শুরু হয় প্রতিরোধ। শুরু হয় প্রতিশোধ। মানুষের মুখে মুখে ঘুরেছে বাঙ্গালির ত্রাতা গোপাল মুখার্জি (গোপাল পাঁঠা)-র নাম। হিন্দুদের এই সক্রিয় প্রতিরোধ ইসলামি আক্রমণকে পর্যুদস্ত করল। ফলে কলকাতা বা পুরো পশ্চিমবঙ্গটাই পাকিস্তানে যায়নি, বরং গঠিত হলো বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ। আজ তাই নাগরিক সংশোধনী আইনের সুবিধায় যাঁরা উজ্জ্বল জীবনের পথে এগোবেন, তাঁদের দায়িত্ব এক ইসলামি হিংসার বিরুদ্ধে পথে নামা। দিকে দিকে উদ্বাস্তু কলোনি থেকে মিছিল বেরুকে, বাজুক শঙ্খ, ঢাক, উড়ুক গেরুয়া পতাকা— ঘোষণা দিন— পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি দৌরাত্ম্যের দিন শেষ। আবার চলতে শুরু করেছে শশাঙ্ক, প্রতাপাদিত্যর রথ।

# সৌভাগ্য লক্ষ্মী মাস পৌষ



**নন্দলাল ভট্টাচার্য**

শুভে-অশুভে এক অনন্য মাস পৌষ। মাস জুড়ে রয়েছে নানা অনুষ্ঠান। রয়েছে অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠার অফুরন্ত সুযোগ। তবুও সব অর্থেই শুভ নয় মাসটি। বিয়ে কিংবা গৃহপ্রবেশ— কোনোটাই হয় না এই মাসে। সেদিক থেকে পৌষ যেন কাকসন্ধ্যা। শুধুই ধর্মকর্ম আর ফসল ঘরে তোলার আনন্দে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠা।

বাংলা বছরের নবম মাস পৌষ। কৃষি নির্ভর জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দে মেতে ওঠার মাস এটি। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাংলা বছরের বারোটি মাসের মধ্যে একমাত্র পৌষই কোনো এক বিশেষ দেবীর নামে চিহ্নিত। মাসটির নাম সৌভাগ্যলক্ষ্মী মাস। সৌভাগ্য

লক্ষ্মীর পুজো হয় এই মাসে। এই পুজো হয় পৌষের অমাবস্যায়। কোজাগরী, চৈত্র এবং ভাদ্র পূর্ণিমার বিশেষ লক্ষ্মী পুজোর মতো পৌষের পূর্ণিমাতেও লক্ষ্মী পুজো হয় বিশেষ ঘটা করেই। গ্রাম বাঙ্গলার এই লক্ষ্মীপুজোর নাম পৌষলক্ষ্মী। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে যে চারটি মাসের পূর্ণিমায় পুজো করে ধনসম্পত্তি ও নানা সম্পদের অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটিই হলো এই পৌষলক্ষ্মী। বহু জায়গায় পৌষলক্ষ্মী পুজোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন চালের পায়েস দেওয়ার বা নবান্ন করারও প্রথা আছে।

পৌষের অমবস্যায় সৌভাগ্য লক্ষ্মীর আরাধনা করা ছাড়াও করা হয় পরলোকগত পিতৃপুরুষদের স্মরণ। এইদিন গঙ্গা বা নদী, সরোবরে পুণ্যস্নান, তর্পণ এবং পার্বণশ্রাদ্ধ করারও বিধি আছে। বিশেষ করে উত্তর ভারতের প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে এদিন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করেন প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে। এই তর্পণ শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষরা তৃপ্ত হন। তাঁদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ে উত্তরপুরুষদের ওপর। তাই সৌভাগ্য লক্ষ্মী মাসটি ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে অতি পবিত্র একটি মাস।

পৌষের অমাবস্যায় সৌভাগ্য লক্ষ্মীর পুজো করা হয় দেবীর দুই রূপে। এই দুই দেবী হলেন ধান্যলক্ষ্মী এবং ধনলক্ষ্মী। নতুন ধান বা ফসল ওঠার আনন্দে এবং আগামীদিনেও প্রভূত ফসল ফলনের প্রার্থনায় এদিন ধান্যলক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। সেই সঙ্গে ধনসম্পদে ঘর যাতে ভরে ওঠে সেই প্রার্থনা জানিয়েই করা হয় ধনলক্ষ্মীর অর্চনা।

পৌষের অমাবস্যার মতোই লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ পুজো করা হয় পূর্ণিমা তিথিতেও। বহু জায়গায় দিনটি অবশ্য পালন করা হয় শাকম্ভরী পূর্ণিমা হিসেবে। দীর্ঘ আকাল এবং দুর্ভিক্ষে জর্জরিত মানবকুলকে রক্ষা করার জন্য দেবী মহামায়া এদিন আবির্ভূতা হয়ে সকলকে শাক ভোজন করিয়ে রক্ষা করেন বলে দেবীর নাম হয় শাকম্ভরী। পৌষের পূর্ণিমা তিথিতেই দেবীর এই রূপ আবির্ভাব ঘটেছিল বলে দিনটি শাকম্ভরী পূর্ণিমা নামেও খ্যাত। বহু জায়গাতেই এদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে শাকম্ভরী দুর্গারও পূজার্চনা করা হয়।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, পৌষের এই লক্ষ্মীপুজো প্রকৃতপক্ষে কৃষিনির্ভর লোকসমাজের ফসল তোলার আনন্দের উৎসব। এই উৎসবে মেতে ওঠে সকলে স্বতস্ফূর্ত আনন্দে।

জ্যোতিষ মতে, পৌষ হলো রবির মাস। তাই বিভিন্ন রূপ ও নামে রবি বা সূর্যের আরাধনা করায়ত্ত রীতি চালু আছে এদেশে। এই সূর্য পুজোর আয়োজন করেন বাড়ির মহিলারা। বস্তুত পৌষমাসের প্রায় প্রতিটি ধর্মানুষ্ঠানেই রয়েছে বাড়ির মহিলাদের মুখ্য ভূমিকা। মহিলাদেরই লক্ষ্মী রূপে যেন পুজো করা হয় এসব ক্ষেত্রে।

পৌষলক্ষ্মীর পুজো প্রবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি কাহিনি। একদেশে ছিল এক গরিব বামনি। পাঁচ ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ছোটো ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মারা যায় তার বাবা। ফলে নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বামনি আতান্তরে পড়ে। চারদিকে কাজকর্ম করে জোটে তাতে কোনোদিন একবেলা, কোনোদিন আধপেটা খেয়ে তাদের দিন কাটে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বামনির মেয়ে একদিন বলে, মা, মামা তো খুব বড়োলোক। যাও না, যদি কিছু দেয়, তাহলে দুটি খেয়ে বাঁচব।

মেয়ের কথায় বামনি কোলের ছেলেটিকে কাঁখে নিয়ে যায় ভাইয়ের বাড়ি। ভাই তখন বাড়ি ছিল না। ভাজের তো ননদকে দেখেই মুখভার। বলে, কী ঠাকুরঝি, এখানে কী মনে করে?

বামনি বলে তার দুঃখের কাহিনি। শুনে ভাজ বলে, খুবই কষ্টের কথা। তবে কী জানো ঠাকুরঝি, তোমার ভাইয়ের অবস্থাও

এখন খুব একটা ভালো নয়। তাহলেও তোমরা হলে আপনজন। তোমাদের তো ফেলে দিতে পারি না। এক কাজ করো, তুমি বরং এসে আমার চাল-ডালগুলো একটু ঝেড়ে দিও। খুদ-কুড়ো যা হবে, সব তুমিই নিয়ে যেও। আর বাড়ির কাজগুলো যদি একটু করে দিয়ে যাও ভাতটা তরকারিটা যা বাঁচবে, তোমাকে দেব এখন।

কী আর করে বামনি। ওই দাসীবৃত্তি মেনে নিয়ে যেটুকু পায়— তা তুলে দেয় ছেলে-মেয়েদের মুখে। ভাইয়ের উঠোনে হয়েছিল একটা লাউ গাছ। লকলকিয়ে উঠেছিল তার লতাগুলো। বামনি বলে, দুটো লাউডগা দেবে, ফুটিয়ে খাব।

ভাজ বলে, ওকথা মুখেও বলো না। তোমার ভাই জানতে পারলে একবারে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে ছাড়বে। এ কথায় মুখ কালো করেই বাড়ি ফিরে যায় বামনি।

দিন দুই পরে, কাজ সেরে ঘরে যাবে বামনি, সে সময় ভাজ বলে, মাথায় বড্ড উকুন হয়েছে। একটু বেছে দিয়ে যাও না। আমি না হয় দুটো লাউপাতা দেব তোমাকে।

বামনি বলে, আজ লক্ষ্মীবার, উকুন মারতে নেই। কালকে তোমার চুল বেছে দেব এখন!

শুনেই অগ্নিমূর্তি ভাজ। বলে, নিজেরটা দেখছি ভালোই বোঝ, লক্ষ্মীবারে খুদ নিয়ে যাচ্ছ যে! এতে যে ভায়ের অকল্যাণ হবে সে দিকে কোনো হুঁশই নেই। কথাগুলো বলে বামনির আঁচলে বাঁধা খুদের সবটাই নিয়ে নেয় ভাজ।

মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের পথ ধরে বামনি। রাস্তার ধারে দেখে একটা গোখরো সাপ মরে পড়ে আছে। বামনি বলে যা থাকে কপালে। আজ এই সাপটাই রান্না করব। এই বিষাক্ত সাপ খেয়েই মরব সকলে।

বামনি সাপটা বাড়িতে এনে কেটেকুটে জল আর নুন দিয়ে হাঁড়িতে চাপায়। ফুটতে থাকে সাপের মাংস। এক সময় উথলে ওঠা ফেনা। অবাক কাণ্ড। এযে সোনার ফেনা। যত জাল দেয় ততই ওঠে সোনার ফেনা।

বামনি একটা খুরিতে খানিকটা সোনার ফেনা নিয়ে বড়ো ছেলেকে বলে, বাজারে স্যাকরার কাছে বেচে যা পাবি তা দিয়েই খাবার কিনে আন।

ছেলে যায় বাজারে। স্যাকরা তো এতে ভালো সোনা পেয়ে দারুণ খুশি। ন্যায্য দাম দেয় সে ছেলেটিকে। খুশিতে ভালো ভালো খাবার কিনে ঘরে ফেরে ছেলে।

সেদিন ছিল পৌষমাসের পূর্ণিমা, তার ওপর বৃহস্পতিবার। বামনি ভাবলো, এসবই হয়েছে মা লক্ষ্মীর দয়ায়। তাই ওইদিনই পুজো করবে সে লক্ষ্মীর।

ভাবনা মতোই কাজ। বামুন এনে খুব ঘটা করে করল পুজো। মা লক্ষ্মীরও দয়া হয়। সেই সোনার ফেনা বেচে অনেক টাকা পায় বামনি। বাড়ি ঘর তৈরি করে খুব সুখে কাটতে থাকে দিন। দেশের রাজা উপযাচক হয়েই বামনির মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দেয়। বামনি তার ছেলেদেরও বিয়ে দেয় বড়ো ঘরে। বউ-জামাই নিয়ে বামনির তখন সুখের সংসার।

ননদ হঠাৎই খুব বড়লোক হয়েছে শুনে ভাজ এবার নেমন্তন্ন করে সকলকে।

বামনি বউদের হিরে জহরতের গয়নায় সাজিয়ে পালকি করে গেল ভায়ের বাড়ি। ভাজ আদর করে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। তারপর ভালো ভালো আসন পেতে সকলকে খেতে দিল নানা খাবার। বউরা না খেয়ে গা থেকে কিছু গয়না খুলে আসনের ওপরে রাখল। তারপর আপনা আপনি বলতে থাকে—

সোনাদানা হিরে মুক্তো ধন্য মান্য গণ্য।
যাদের কল্যাণে আজ মোদের নেমন্তন্ন।।

একথার অর্থ বুঝতে না পেরে বামনিকে বলে ভাজ, ঠাকুরঝি, ওরা না খেয়ে ওসব কী বলছে?

বামনি বলে, বুঝতে পারছো না! যখন আমরা দুঃখে ছিলুম, খোঁজও নিতে না। দুটো খুদও কেড়ে নিয়েছিলে আঁচল থেকে। দুটো লাউ পাতাও দিতে পারোনি প্রাণে ধরে। আজ আমাদের অবস্থা ফিরেছে, তাই নেমন্তন্ন করেছ সোনা হিরে মুক্তোকে। তাই গয়না খুলে এসব বলছে ওরা।

ভাজ লজ্জা পেয়ে কেঁদে কেটে ক্ষমা চায়। কিন্তু বামনি আর কিছু না বলে বউদের নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

বামনির দিন কাটে সুখে। সুখের কারণ লক্ষ্মী পুজো— ওই পৌষ লক্ষ্মীর আরাধনায় ভুল হয় না তার। বউদেরও সে শেখায় লক্ষ্মীপুজো। তারপর সময় হলে চলে যায় স্বর্গে। বউরা শাশুড়ির কথামতো পৌষ মাসে ভক্তি ভরে লক্ষ্মী পুজো করে। ক্রমে ওই পুজোর কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই পৌষ লক্ষ্মীর পুজো করতে শুরু করে। সেই ধারাতেই আজও বিশেষ করে গ্রাম বাঙ্গলায় ঘটা করেই পৌষলক্ষ্মীর পুজো হয়। ■


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

| | | |
|---|---|---|
| Account Name | : | **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.** |
| A/C. No. | : | **917020084983100** |
| IFSC Code | : | **UTIB0000005** |
| Bank Name | : | **AXIS Bank Ltd.** |
| Branch | : | **Shakespeare Sarani, Kolkata** |

# নিবেদিতার রচনায় মা সারদা

**সুতপা বসাক ভড়**

শ্রীশ্রীমা সারদা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর রচিত 'আচার্যদেব' (The Master as I saw him) পুস্তকে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই পুস্তক থেকে কিছু অংশ সংকলিত করা হলো :

সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী একথা সর্বদা আমার মনে হয়েছে। তবে সত্যিই কি তিনি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, নাকি নতুন আদর্শের প্রথম প্রকাশ? প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সরল সমন্বয় সাধারণ নারীজীবনেও কীভাবে করা সম্ভবপর, তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু আমার কাছে তাঁর অধ্যাত্মমহিমার মতোই অপূর্ব লেগেছিল তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর মুক্ত উদার মনের মহিমা। যতরকম জটিল বা নতুন সমস্যা তাঁর কাছে উপস্থিত করা হোক, আমি তাঁকে কখনও মহৎ ও উদার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে কুণ্ঠিত দেখিনি। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল একটি দীর্ঘ নীরব প্রার্থনা। ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে পরিবেশের ওপরে উন্নীত করতে পারেন। কেউ যদি অপকৃষ্ট আচরণে তাঁকে পীড়িত করে থাকে, তাহলে আর কিছু না করে এক সঘন বিচিত্র নীরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নেন। কেউ তাঁর অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী সামাজিক সমস্যার যন্ত্রণার কথা জানালে তৎক্ষণাৎ তিনি অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ঘটনার মর্মে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে সমাধানের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। যখন প্রয়োজন হয় কঠোরতার, তখন তিনি কোনোরকম বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হন না। যে ব্রহ্মচারীকে আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাঁর আদেশ— তাকে তদ্দণ্ডেই স্থানত্যাগ করতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে যে সাধুর আচরণ লঙ্ঘন করেছে, সে কখনই তাঁর সাক্ষাতে আসার অনুমতি পাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার এই ধরনের দোষী একজনকে বলেছিলেন, ''দেখছ না, ওর ভেতরের নারীমহিমাকে আঘাত করছে তুমি— সর্বনাশ!''

তাসত্ত্বেও 'সুরে সংগীতে নিত্যপূর্ণ' তিনি— তাঁর সংগীত প্রতিভার পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর একজন অধ্যাত্মসন্তান বলেছিলেন, 'আর পূর্ণ মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়।' যে ঘরে তিনি পূজাদি করেন, তা থাকে পরম স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ।

শ্রীমা সারদাদেবী পড়তে পারেন। অনেকটা সময় রামায়ণ পাঠে কেটে যায়, কিন্তু তিনি লিখতে পারেন না। তবে, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই, যে তিনি একজন অশিক্ষিতা নারী। ধর্মীয় বা সাংসারিক বিষয় পরিচালনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই শুধু নয়, ভারতবর্ষের নানান স্থানে ভ্রমণ এবং প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শনের অভিজ্ঞতাও আছে তাঁর।

শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি মাধুর্য এবং শান্তিতে ভরা। প্রত্যূষের আগেই প্রত্যেকে একে একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে, বিছানার মাদুরের ওপর থেকে বালিশ এবং চাদর সরিয়ে, তার ওপর স্থির হয়ে বসেন, দেওয়ালের দিকে মুখ ঘোরানো থাকে, হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপর ঘর পরিষ্কার এবং স্নানাদির সময়। বিশেষ পর্বের দিন একজন সঙ্গিনীর সঙ্গে শ্রীমা পালকিতে গঙ্গাস্নানে যান। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রামায়ণ পাঠ করেন। এরপর মা নিজের ঘরে পূজায় বসেন। যাদের বয়স একটু কম, তারা প্রদীপ জ্বালায়, ধুপ-ধুনা দেয়, গঙ্গাজল, ফুল এবং পূজার জোগাড় করে। গোপালের মা এসে নৈবেদ্য তৈরিতে সাহায্য করেন। তারপর মধ্যাহ্নভোজন ও বিকেলের বিশ্রাম; সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, আমাদের কথালাপের মাঝে ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে আসে; সকলে উঠে পড়ে; আমরা সবাই পট বা বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি। গোপালের মা এবং শ্রীমায়ের পদধূলি নিই, কখনও বা বাধ্য মেয়ের মতো মায়ের সঙ্গে ছাতে উঠি। তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে বসি। পরম সৌভাগ্যবতী সে, যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্য ধ্যানের সময় বসার অনুমতি পায়— মায়ের সকল পূজার আদি ও অন্ত যে গুরুপ্রণামে, সেই প্রণাম করতে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে! ■

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

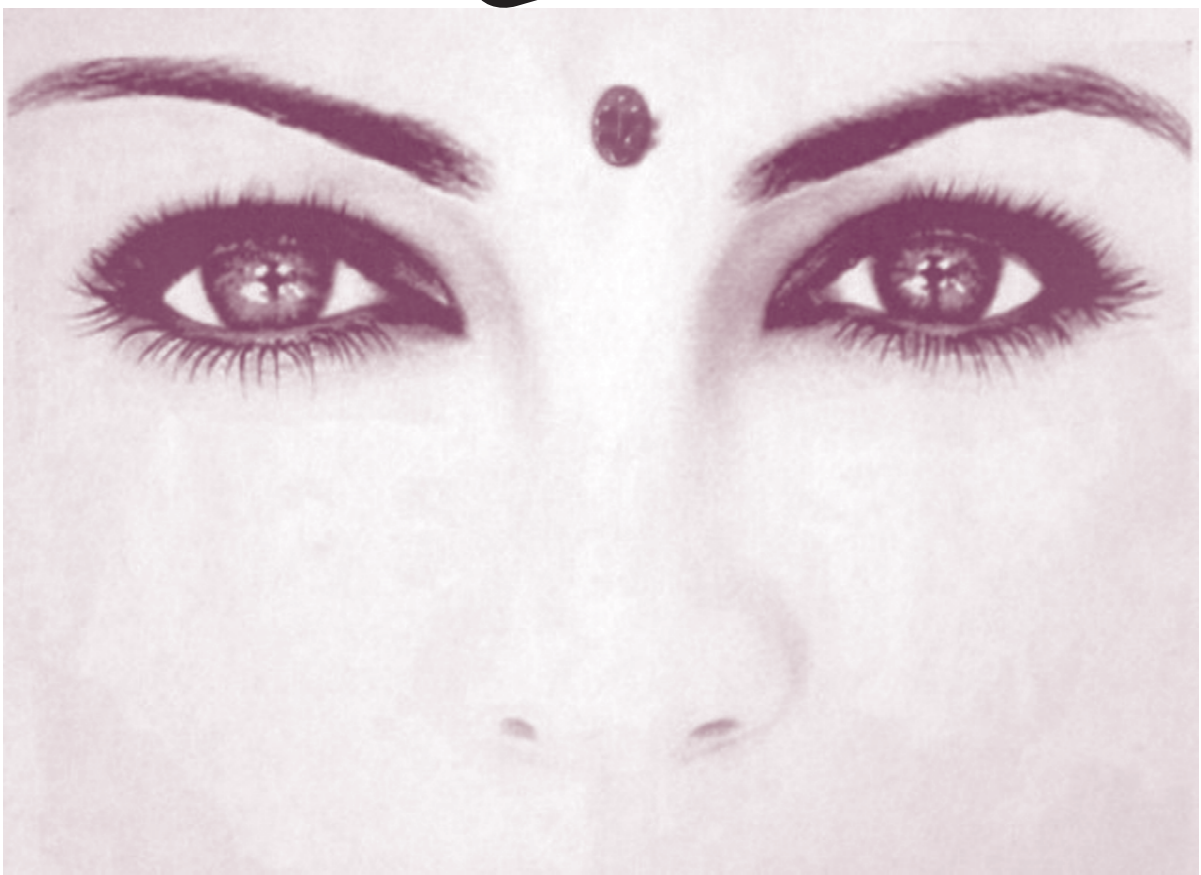

# বিবর্ণ গোধূলি

চিত্রলেখা দাশ

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ। শুধু চরাচরে নয় সুনেত্রার জানলার বাইরেও আঁধারের রসায়ন। আকাশের বুকে একটা দুটো করে তারা ফুটছিল। চারপাশে মন কেমন করা নিস্তব্ধতা। নেই কোনো ব্যস্ততার দৌড়ঝাঁপ। হৈ হৈ হল্লোড়ের ছোটাছুটি। শুধু শান্ত অন্ধকার আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের বুকে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর মাথায়, সুনেত্রার এই চার দেওয়ালের মধ্যে। এই সময়টাতে সুনেত্রার খুব কষ্ট হয়। কাউকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু পারে না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার স্রোত বুকের গভীর থেকে উঠে আসতে আসতে ডুবে যায় মনের অতলে। দম আটকে আসে। মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। চারপাশে শুধুই শূন্যতা।

সুনেত্রার চাপা শ্বাস। কেন এমন হয় কে জানে! এ কি একাকিত্বের দোলাচল? জানলাপথে সুনেত্রার দৃষ্টি বাইরের আঁধারে। আকাশ অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে তারাগুলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত বাড়ায় সুনেত্রা। ঝটপট শব্দে জানলার বাইরে উড়ে যায় কোনো রাতচরা পাখি। নিঃশব্দে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ে সুনেত্রার চার দেওয়ালে।

—আসতে পারি?

চোখ তোলে সুনেত্রা। অন্ধকারেও অগ্নিভর গলা চিনতে ভুল হয় না। অগ্নিভ দত্ত, এই প্রাইভেট হাসপাতালের আর এম ও।

—আসুন। ছোট্ট জবাব সুনেত্রার।

—অন্ধকারে শুয়ে রয়েছেন। জানলা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। ছেলেগুলোকে এতবার বলা হলো। কেউ নিজের কাজ ঠিকঠাক করছে না। সবাই গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছে। আশ্চর্য!" ক্ষোভ অগ্নিভর গলায়।

—না, না কারো কোনো দোষ নেই। সময়মতোই পুলক এসেছিল। আমিই আলো জ্বালাতে বারণ করেছি। জানেন তো উজ্জ্বল আলো আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না ডাঃ দত্ত। সদ্য ফুটে ওঠা তারার আঁকিবুকিতে সাঁঝের আকাশের রূপটাই পালটে যায়। সেই রূপ দেখার লোভে জানলা লাগাতে দিইনি।

মুহূর্তে আগুন জ্বালানোর শব্দ। মোমবাতি জ্বালছে অগ্নিভ। বিছানার পাশের টেবিলে মোমবাতি বসিয়ে সরে যায় অগ্নিভ। এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়ে সুনেত্রার চোখের তারায়। উদ্ভাসিত সুনেত্রার মুখ। সামনের আয়নায় চোখ সুনেত্রার। মৃত্যুপথযাত্রী বর্তমানের বাইশের সুনেত্রার সঙ্গে অতীতের সুনেত্রার কোনো মিল নেই। তবু অতীতের ছবিগুলো ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। মোমবাতির আবছা আলোয় কানে বাজছে সুজয়ের গলা—

দিন আর রাত্রির মাঝখানে পাখি ওড়া ছায়া

মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের শেষ দেখা শোনা।

হয়তো নিছকই আবেগের বশে সেদিন শঙ্খ ঘোষের লাইনগুলো আওড়েছিল সুজয়। কিন্তু কবির কথাগুলো যে এভাবে সত্যি হবে তা সেদিন বোঝেনি সুনেত্রা। সুজয়ের সঙ্গে সেদিনের দেখাই শেষ দেখা। শেষ কথা বলার মুহূর্ত।

—কী ব্যাপার সুনেত্রা! কী ভাবছেন?

অগ্নিভর কথা কানে যায় না। ফিসফিস করে সুনেত্রা—

আমি যে ঘুমোই, জানি, তুমি ঠিক এসে দাঁড়াবেই

শিয়রের কাছে। আরও জানি, তুমি ওই দুটি জানালা প্রথম

খুলে দেবে ধীরে ধীরে। তারপর হাওয়া লেগে কেঁপে ওঠা মোম

সাবধানে আড়াল করে দাঁড়াবেই।

—সুনেত্রা। কপালে শীতল স্পর্শ। চমকায় সুনেত্রা।

—কী ভাবছিলেন সুনেত্রা?

—আমি আর কতদিন বাঁচব ডাঃ দত্ত?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন সুনেত্রা?

—আমার বড্ডো বাঁচতে ইচ্ছে করে ডাঃ দত্ত। ব্যাকুল স্বর সুনেত্রার।

অগ্নিভ নিরুত্তর। নীরবে সুনেত্রার কপালে হাত বুলিয়ে বলে, সুজয়ের কথা ভাবছিলেন?

—সুজয়! আগে চোখ বুঁজলেই মুখটা সামনে ভেসে উঠত। এখন আবছা, —অস্পষ্ট। কতদিন দেখা হয়নি। চাপা শ্বাস সুনেত্রার।

—জানেন ডক্টর, সুজয় বড্ডো কবিতা পাগল ছিল। কথায় কথায় এখান সেখান থেকে কবিতার লাইন কোট করত। আচ্ছা ডক্টর সুজয় কি এখনও আগের মতোই আছে?"

অগ্নিভ চুপ। কোনো উত্তর দিতে পারে না। কী-ই বা বলবে? গতকাল সুনেত্রার নামে কলকাতা থেকে একখানা চিঠি এসেছে। সুজয়ের চিঠি। প্রত্যেকদিনই নানা চিঠিপত্র আসে। আর এম ও হওয়ার সুবাদে সেগুলো জমা হয় অগ্নিভর টেবিলে। অন্যদিনের মতো গতকাল সান্ধ্যভিজিট সেরে চেম্বারে ঢুকে টেবিলের ওপর রাখা চিঠিগুলোর মাঝে 'শুভবিবাহ' কার্ডখানার ওপর নজর আটকে যায় অগ্নিভর। ওপরে সুনেত্রার নাম দেখে কৌতূহলবশত খাম ছিঁড়তে চোখে পড়েছিল সুজয় আর দিমিত্রির নাম। সুনেত্রার মুখ থেকে অনেকবার শুনেছিল দিমিত্রির নাম। দিমিত্রি সুনেত্রার বোন। কার্ড খুলতে পেয়েছিল ছোট্ট একটা চিরকুট, ''সুনেত্রা, সামনের মাসের পাঁচ তারিখে দিমিত্রিকে বিয়ে করছি। দুজনেই তোকে খুব মিস করছি।" সুজয়।

—জানেন ডাঃ দত্ত, একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। পাশের বাড়ির জানলা থেকে সুজয় যে আমায় দেখছিল খেয়াল করিনি। খানিক পরে আমার মুঠোফোন বেজে উঠল। বোতাম টিপতে ওপাশে সুজয়ের গলা—

সংকোচে জানাই আজ; একবার মুগ্ধ হতে চাই।

তাকিয়েছি দূর থেকে। এতদিন প্রকাশ্যে বলিনি।

এতদিন সাহস ছিল না কোনো ঝর্নাজলে লুণ্ঠিত হবার—

আজ দেখি, অবগাহনের কাল পেরিয়ে চলেছি দিনে দিনে।"

—সুনেত্রার উচ্ছ্বসিত স্বরে অগ্নিভর চিন্তা ভঙ্গ।

''সুনেত্রা।" গাঢ় স্বর অগ্নিভর।

''বলুন ডক্টর।"

অগ্নিভ বুঝতে পারছিল না খবরটা সুনেত্রাকে দেওয়া উচিত কিনা। আর ক'দিনই বা বাঁচবে মেয়েটি। আচমকা এতবড়ো শূন্যতার সংবাদটা সহ্য করতে পারবে তো! পলকহীন অগ্নিভ সুনেত্রাকে দেখছিল। মোমবাতির আবছা আলোয় ওকে অন্য জগতের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

—কী হলো অমন করে কী দেখছেন? সুনেত্রার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

অগ্নিভ দেখছে মোমটা গলে গলে টেবিলে পড়ছে। এক সময় জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যাবে মোমবাতিটা। তারপর সব শূন্য। একটু একটু করে শূন্যের দিকে এগোচ্ছে বলেই বোধহয় শিখায় এত সৌন্দর্য!

—আপনিও কি সুজয়ের মতো কবি হয়ে গেলেন? অগ্নিভর হাতে সুনেত্রার আলতো ছোঁয়া।

মুখের দু' পাশে খোলা চুল। কালিপড়া চোখের তারায় হাজার তারার ঝলকানি। সুনেত্রাও তো প্রতিদিন একটু একটু করে শূন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই কি ওকে এত সুন্দর লাগছে! চাপা শ্বাস অগ্নিভর।

—একবারে চুপ করে গেলেন যে। কিছু তো বলুন।

—আপনি কি জানেন সুজয় আর কোনোদিন আপনাকে ফোন করবে না। কোনোদিন এখানে আসবেও না। কোনোরকমে বলে অগ্নিভ।

চমকায় সুনেত্রা।

—কে বলেছে?

—গতকাল কলকাতা থেকে আপনার নামে সুজয় আর দিমিত্রির বিয়ের কার্ড এসেছে। দেওয়া হয়নি আপনাকে।

আরও কিছু বলছিল অগ্নিভ। সুনেত্রার কানে কিছুই ঢুকছিল না। একটা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ছিল মাথায়, সারা শরীরে, সমস্ত অনুভবে।

—না এ হতে পারে না। আর্তকণ্ঠ সুনেত্রার।

জানলা দিয়ে ছুটে আসা বাতাসে নিভে যায় মোমবাতি। অন্ধকারে ডুবে যায় চারপাশ।

—আমি উঠি। অনেক রাতও হয়েছে। নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আলো দিয়ে যাবে। চেয়ার ছাড়ে অগ্নিভ।

—না, না আপনি যাবেন না। প্লিজ থাকুন। অন্ধকারে একা থাকতে ভালো লাগে না অগ্নিভ। ব্যাকুল স্বর সুনেত্রার।

অগ্নিভ চমকে ঘুরে তাকায়। যদিও অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না। ডক্টর থেকে অগ্নিভ। হয়তো আনমনে বলে ফেলেছে। যেতে গিয়েও কী এক অদৃশ্য টানে থমকে দাঁড়ায়। সুনেত্রা কিছুই বলছিল না। অন্ধকার ঘরের নিস্তব্ধতায় শুধু ঘড়ির শব্দ, দুজন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে কেউ বুঝতে পারেনি। নিস্তব্ধতা ভাঙে নার্সের গলায়।

—স্যার আসব?

ও স্বপ্না। আসুন। আমিই ডাকব ভাবছিলাম। মোমবাতিটা হঠাৎ নিভে গেল। নিজেকে সামলে বলে অগ্নিভ।

মোমের আলোয় হাতঘড়িতে নজর পড়তে অস্বস্তি অগ্নিভর। প্রায় ন'টা। সুনেত্রার খাওয়ার সময়। আর থাকা ঠিক নয়।

—গুড নাইট। ধীর পায়ে বেরিয়ে যায় অগ্নিভ।

হাসপাতালের সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায় অগ্নিভ। নয় নম্বর রুমে আলো জ্বলছে না। মিসেস

চৌধুরী থাকতেন। কাল মারা গেছেন। ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজ চলছিল। ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। নিজের অজান্তে সুনেত্রার ঘরের দিকে নজর চলে যায় অগ্নিভর। হাওয়ায় পর্দা উড়ছে। হয়তো সুনেত্রা খাচ্ছে।

২

সকাল ন'টা। সুনেত্রা অ্যালবামের পাতা উলটে চলেছে। মনের পরতে পরতে জমে থাকা অনুভূতিগুলো ফোটা শিউলির মতো টুপটুপ করে ঝড়ে পড়ছে। মন খারাপের অনুভব ডানা মেলেছে নিঃসীম শূন্যতায়। না, কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। নেই কোনো আক্ষেপ। হয়তো এমনটাই তার ভবিতব্য। গলার কাছে অদ্ভুত একটা কষ্ট দলা পাকাচ্ছে। চোখের সামনে বিভিন্ন বয়সের সুনেত্রার ছবি। কোনোটায় বাবা-মায়ের সঙ্গে সুনেত্রা। কোনোটায় সুনেত্রা আর দিমিত্রি একসঙ্গে। অ্যালবামের পাতায় দিমিত্রির হাসিমুখ। দিমিত্রি ফরসা, লম্বা, স্মার্ট, অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলে, লেখাপড়াতেও ভালো। তার পাশে সুনেত্রা! নিতান্তই আটপৌরে। সময় কাটানোর জন্য তাকে নিয়ে হয়তো দু'চার লাইন কবিতা আওড়ানো যায়। কিন্তু সারাজীবন সম্পর্কের বাঁধনে বাধা যায় না। এতদিন ধরে সে সুজয়কে নিয়ে মিথ্যে স্বপ্ন দেখেছে।

—সুনেত্রা। দরজায় অগ্নিভ।

সুনেত্রা সামান্য হেসে অ্যালবাম বন্ধ করল।

—আমি খুব বোকা অগ্নিভ। খুবই বোকা।

অগ্নিভর শরীর জুড়ে কাঁপুনি। সুনেত্রার মুখের দিকে তাকায়। ধীর, স্থির। নেই কোনো ভাবন্তর।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঠোঁট ফাঁক অগ্নিভর, বিকেলে তৈরি থাকবেন। ডাঃ রায়ের কাছে যেতে হবে। আপনার কেসের ব্যাপারে আলোচনা আছে।

—মাপ করবেন ডাক্তারের কাছে যেতে আমার ভালো লাগে না। আমার শেষ তো জেনে গিয়েছি। বৃথা কেন টানাহ্যাঁচড়া। আমি বিকেলে বেড়াতে যাব। যে ক'টা দিন আছি দু'চোখ মেলে শুধু প্রকৃতি দেখতে চাই। দৃপ্তস্বর সুনেত্রার।

—বেড়াতে যাবেন! কার সঙ্গে? কৌতূহল অগ্নিভর।

—আপনার সঙ্গে। কেন সময় হবে না আপনার?

—অগ্নিভর শরীর জুড়ে শিহরণ। শিরায় শিরায় এক অনাস্বাদিত সুখ। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিল না অগ্নিভ। ভেসে যাচ্ছিল এক আবেগের স্রোতে। যদিও জানে এসবের কোনো স্থিরতা নেই। তবু কিছু সময়ের জন্য একটা সুখের অনুভব।

এ আমায় কোথায় নিয়ে এলেন অগ্নিভ?

অগ্নিভ দেখছিল। দেখেছিল দু'চোখ ভরে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের আভায় চকচক করছিল সুনেত্রার চুল। অস্তগামী বিষণ্ণতাও কত সুন্দর!

—আপনিই তো বেড়াতে আসতে চাইলেন। বলে অগ্নিভ।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায় অগ্নিভ।

—ওই দেখুন সুনেত্রা ওখানে মিসেস চৌধুরীকে দাহ করা হয়েছিল। গাঢ় বিষণ্ণ স্বর অগ্নিভর।

—আমরা কেন শ্মশানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি অগ্নিভ। আমার ভীষণ ভয় লাগছে। প্লিজ ফিরে চলুন। ভয়ার্ত স্বর সুনেত্রার।

আলতো করে সুনেত্রার হাত ধরে অগ্নিভ।

—কেউ চিরকাল বাঁচে না সুনেত্রা। কাউকে আগে যেতে হয়। কেউ হয়তো পরে যায়। কিন্তু যেতে সবাইকেই হয়। কেন মিছিমিছি ওসব নিয়ে ভাবছেন। ওই দেখুন, ওধারে একটা চিতা জ্বলছে।

—না, না আমি দেখতে পারব না। আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন অগ্নিভ। প্লিজ। দু'হাতে চোখ ঢাকে সুনেত্রা।

অগ্নিভ পরম মমতায় সুনেত্রাকে কাছে টেনে নেয়।

—আমি আছি সুনেত্রা। আপনার পাশেই আছি। ভয় পাবেন না। ওদিকে তাকান। জীবন মানে জন্ম-মৃত্যু। জীবন মানে আসা যাওয়া। জনমে যে চলার শুরু মরণে তার শেষ। একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ। তাহলে মিছে কেন ভয়। তাকান সুনেত্রা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে সুনেত্রা। অগ্নিভ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত চিতার দিকে। সুনেত্রার মুখ ঘুরিয়ে দেয় চিতার দিকে।

গনগনে আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। হয়তো যে কোনো মুহূর্তে স্পর্শ করে ফেলবে আকাশ। চার পাশ লাল হয়ে উঠেছে। ফটফট শব্দে ফেটে ছিটকে যাচ্ছে কাঠের টুকরোগুলো। কখন যে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে সুনেত্রা খেয়াল করেনি। আগুনের তেজ বাড়ছে। সুনেত্রা ধীর পায়ে এগিয়ে যায়। আগুনের লালচে আভায় আলোকিত সুনেত্রার চোখমুখ। সারা শরীর। সুনেত্রা চোখ বন্ধ করে ফেলল। চোখ বুজে এখন আর অন্ধকার নয় আগুন দেখছে। সুনেত্রার মুখে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে আগুনের শিখা। সুনেত্রার মনে হচ্ছিল তার ভেতর থেকে উঠে আসছে আগুন। সুনেত্রা পুড়ছে, জ্বলে যাচ্ছে সারা শরীর। জ্বলতে জ্বলতে একটু একটু করে ছাই হয়ে যাচ্ছে। একসময় সুনেত্রার পুরো শরীরটাই শেষ হয়ে গেল। তবু সুনেত্রা অবাক হয়ে দেখল সে বেঁচে আছে। তার তো থাকার কথা ছিল না। শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব তো তেমন নয়। সে তো বেঁচে আছে।

কখন যেন অগ্নিভ সুনেত্রার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সুনেত্রার মুখের দিকে।

প্রাণভরে শ্বাস নিল সুনেত্রা। সুনেত্রা দেখছিল— সুনেত্রা আছে অন্ধকারে, আগুনে, আকাশে, বাতাসে, ঘাসে, পাতায়। শূন্যতাও বোধহয় সম্পূর্ণ শূন্য হয় না।

অগ্নিভ ধীর, শান্ত স্বরে বলল, চলুন ফিরি।

অন্ধকার গায়ে মেখে হাঁটছে দুজনে।

সুনেত্রা বলে, আপনি কবিতা পড়েন অগ্নিভ?

—আগে নিয়মিত পড়তাম। এখন পড়ি মাঝে মাঝে। শুনবেন?

সুনেত্রা উৎসুক চোখে তাকায়।

''তলিয়ে চলেছি, চলো আমার দু-পাশে পালকেরা

ফেলে আসব না আর কোনো চোখ যা কূপের নীচে এতদিন

তাকিয়ে থেকেছে— এক ডিমের তরলে ভাসমান

পাখির আত্মায় আমি তলিয়ে চলেছি, বিষ্ণু, চারিদিকে রত্ন তরলের

শতধারা ফেটে যায় দশ লক্ষ নাভি থেকে— সে সব গহন ক্ষতমুখে

ফুঁসে ওঠে দাহ্য সব রংকণিকারা

আমাকে এ মরবেগ চাপ দাও মুছে ফ্যালো দুধসুড়ঙ্গের তলদেশে।''

—অগ্নিভর গলায় জয় গোস্বামীর লাইনগুলো শুনতে শুনতে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সুনেত্রা।

পরম নির্ভরতায় অগ্নিভর বুকে মাথা রাখে। হোক সাময়িক তবু তাতেই গভীর তৃপ্তি। শূন্যতার আগে পরম পূর্ণতা। ■

# বিভূতিভূষণের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

**মালিনী চট্টোপাধ্যায়**

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ রোমান্টিক। বস্তুত এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর রচনাকে তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের রচনা থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। Walter Pater ক্লাসিক ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ''A Greck temple, statue or poem has no imperfection and offiers no further promise, indicates nothing beyond what it expresses. It fills the sense, it leaves nothing to the imagination. It stands correct, symmetric, sharp in outline, in the clear light of the day...But in romantic art there is seldom this completeness. The workman lingers, he would fain, add another touch, his idea eludes him... The modern spirit is mystical.'' আবার C.M. Herford-এর মতো অনেক সমালোচকের মতে কল্পনার আতিশয্যই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদিক দিয়ে বিভূতিভূষণ রোমান্টিক। তাঁর প্রায় সমস্ত চরিত্র কল্পনাপ্রবণ। প্রকৃতি তাঁর কাছে রহস্যময়। সমস্ত রহস্যময়তা নিয়ে সে 'পথের পাঁচালীর' অপুকে, 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্করকে, 'হীরা মানিক জ্বলে'-র সুশীলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপন্যাস কবিতার মতো নয়, তাকে বাস্তববর্জিত হলে চলে না। সেইজন্য বিভূতিভূষণের উপন্যাস ও ছোটোগল্পের পটভূমি উনিশ শতকের বাঙ্গলা। সেই বাঙ্গলার দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, সামাজিক বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা, সবই এসেছে তাঁর উপন্যাসে। তবু তিনি রোমান্টিক, বস্তুত অনিন্দসুন্দর নর-নারীর দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে রূপহীন কঙ্কাল, পদ্মাকেও কাটাছেড়া করলে তার রূপ থাকে না।

নীলাকাশকে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় নিছক ধূলিকণার উপর সূর্যের আলো পড়েছে আর তাই দেখেই আমরা মুগ্ধ হয়েছি, সেভাবে দেখলে চাঁদও সৌন্দর্য হারায়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসকেও বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট কিছু চরিত্রের অনুভূতি, দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা, সমাজপ্রভুদের নিষ্ঠুরতা। বাস্তবের এই অনুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনাতেও রয়েছে, কিন্তু এসব ছাপিয়ে যে কল্পনাপ্রবণতা, জীবন ও প্রকৃতির রহস্যময়তার নিদর্শন রয়েছে তাই তাঁর রচনাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে।

বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নিঃসন্দেহে 'পথের পাঁচালী'। ভাবতে অবাক লাগে এ উপন্যাসের পটভূমি উনিশ শতকের একটি সাধারণ গ্রাম, যেখানে দারিদ্র্য রয়েছে, সামাজিক বৈষম্য রয়েছে, ধনবানের দরিদ্রের প্রতি বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য রয়েছে। আর রয়েছে নিরুপায় মানুষের জীবনে জরা, রোগ ও মৃত্যুর আবির্ভাব। বিভূতিভূষণ জানতেন তাঁর অনন্য-সাধারণ বালক নায়ককে পরিস্ফুট করার জন্য এই বাস্তবনিষ্ঠ পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত উপন্যাসে পটভূমি ও চরিত্র দুই-ই সাধারণের নাগালের বাইরে হলে উপন্যাস আকর্ষণ হারায়। এইচ. বি. ল্যাথরূপ তাঁর 'Art of Novelist'-এ বলেছেন, ''If the character is superior, he should be viewed against an ordinary backdrop.'' তাই নিশ্চিন্দিপুর এক সাধারণ গ্রাম। এ গ্রামে যে ফুল ফোটে সে সমস্ত ফুল বিত্তশালীর শৌখিন বাগানে ঠাঁই পায় না। মমতাময়ী মা সর্বজয়া শুধুই নিজের সংসারের স্বার্থ দেখে, অসহায় ইন্দির ঠাকরুণকে বড়িতে ঠাঁই দেয় না। কিশোরী দুর্গা ধনী গৃহিণীর সোনার সিঁদুর কৌটো দেখে প্রলুব্ধ হয়ে চুরি করে। এ গ্রামেরই পথে ঘাটে উপন্যাসের বালক নায়ক ঘুরে বেড়ায়। যার অবোধ, স্বপ্নময়, কল্পনাপ্রবণ চোখ সাধারণ খরগোশ দেখে, অতি সাধারণ ফুল ফল দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, কুঠির মাঠ দেখে ভাবে, ''এই মাঠের পরেই কি রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়। ওধারে আর মানুষের বাস নাই। জগতের শেষ সীমাটাই এই, ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।''

'পথের পাঁচালী'র পূর্বে রচিত ছোটোগল্প 'পুঁইমাচা'র খেন্তি যেন দুর্গারই পূর্বসূরি। দুর্গার মতোই সে লোভাতুর। তারই মতো তার বহির্জগতে বিহার। অতঃপর বয়সে অনেক বড়ো পাত্রের সঙ্গে তার পরিণয় ও শ্বশুরালয়ে অনাদরে, অবহেলায় মৃত্যুবরণ। ছিন্নমুকুলের মতো সে ঝরে যায় পৃথিবীর বুক থেকে কিন্তু তার লাগানো পুঁইগাছটি রয়ে যায় যেন তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

বিভূতিভূষণ রচিত কিশোর উপন্যাসগুলিতেও আমরা বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। রোমান্টিক মানসিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সুদূরের প্রতি আকর্ষণ। 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের শঙ্করও অপুর মতোই সুদূরের পিয়াসী। বাবার অসুস্থতা, সংসারের দারিদ্র্য, মায়ের নির্দেশে পড়াশুনা মাঝপথে থামিয়ে চাকরির সন্ধান— কিছুই তার রোমান্টিক মনকে নষ্ট করতে পারেনি। —তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর দূর দেশে— শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্টানলির মতো, হ্যারি জনসন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মতো। অবশেষে তার স্বপ্ন সফল হয়। সে প্রতিবেশিনী ননীবালা দিদির আফ্রিকায় কর্মরত স্বামী প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় আফ্রিকায় চাকরি পায়। সেখানে পদে পদে বিপদ, তবু এই জীবনই তো সে চেয়েছিল। অবশেষে আলভারেজকে সঙ্গী করে হীরের খনির সন্ধানে সে রিখটারসভেল্ট পর্বতে পদার্পণ করে। আলভারেজের মৃত্যু হয়, কিন্তু শঙ্কর হীরের খনির সন্ধান পায়। রোমান্টিক বিভূতিভূষণ বাস্তবের মাটিতে পা দিয়েই স্বপ্ন দেখেছেন।

তাই মরুভূমিতে নিরুপায় শঙ্করকে শকুনির মাংস খেতে হয়, তাই অসীমসাহসী আলভারেজও বুনিপকে ভয় পায়। তাই 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসে চীন-জাপান যুদ্ধের নিখুঁত বর্ণনা, আবার 'হীরা মানিক জ্বলে' উপন্যাসে শত শত বিপদকে তুচ্ছ করে সুশীল, সনৎ ও জামাতুল্লা রত্নভাণ্ডারের খোঁজ করতে করতে নির্জন দ্বীপের সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়। ■

# বিশ্বনায়ককে দেখে নিল কলকাতা

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যার পরম ভক্ত, যার নামে নাসা স্পেস সেন্টারে এমিরিটাস চেয়ারের নামকরণ করা হয়েছে সেই বিস্ময়কর প্রতিভা মাগনাস কার্লসেনকে টানা পাঁচদিন ধরে দেখা কলকাতাবাসীর পক্ষে এক পরম প্রাপ্তি। বিগত ৫০ বছরে বহু বিশ্বনায়ককে দেখেছে কলকাতা, তার সর্বশেষ সংযোজন নরওয়ের এই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সুপার গ্রান্ডমাস্টার। যিনি তার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জয়ের অভিযান শুরু করেছিলেন ভারতগৌরব বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে। ২০১৩ এবং ২০১৪ পরপর দু'বছর তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে। তারপর আরও তিনবার তিনি এই মহার্ঘ খেতাব জিতেছেন। এহেন নরওয়েজিয়ান কার্লসেন যথারীতি ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষাভবনে আয়োজিত টাটা স্টিল ইন্ডিয়া ওপেন গ্লোবাল চেজ ট্যুর ইভেন্টে সবাইকে টেক্কা দিয়ে বিজয়ীর মুকুট মাথায় তুলে নিলেন।

টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল কিংবদন্তী গ্যারি কাসপারভের। যেহেতু গ্লোবাল গ্রান্ড চেজ ট্যুর ইভেন্ট আইডিয়াটি তারই মস্তিষ্কপ্রসূত এবং তার সংস্থা এই আট পর্বের প্রতিযোগিতাকে বিশ্বের আটটি শহরে লঞ্চ করে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারতে পরীক্ষামূলক ভাবে এই আসর বসানো হয়েছে। দর্শক সমাগম, টাটাস্টিল কর্তৃক টুর্নামেন্ট সংগঠন, পুরস্কারমূল্য সবকিছু বিবেচনা করে কাসপারভের সংস্থা ঠিক করেছে এবার থেকে কলকাতাই হবে ভারত তথা এশিয়াপর্বের একমাত্র হোস্ট। এবছর সবশেষ প্রতিযোগিতা হবে ডিসেম্বরে লন্ডনে। যা হবে গ্লোবাল ট্যুর ফাইনাল। সেই ফাইনাল যে ৫ জন খেলবে তার মধ্যে তিনজনই এবার কলকাতায় খেলে গেল।

ম্যাগনাস কার্লসেন ছাড়া হিকারু নাকামুরা, লেভল অ্যারোনিয়ান লন্ডনে ফাইনাল ইভেন্টে খেলবেন। অনেক আশা ছিল 'ভিসি' বা বিশ্বনাথন আনন্দকেও দেখা যাবে লন্ডনে। কিন্তু কলকাতা মিটে চূড়ান্ত হতাশ করেছেন আনন্দ। এমনকী আনন্দের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় প্রতিভা পেন্টাইয়া হরিকৃষ্ণ ক্লাসিক ফরম্যাটে কার্লসেনকে হারিয়ে চমকের সৃষ্টি করলেও ছিটকে গেলেন। বিশ্বের ১৫ নম্বর দাবাড়ু হরিকৃষ্ণ জুনিয়রে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিশ্ব দাবা নেশনস কাপে (দেশগত টুর্নামেন্ট) ভারতকে ব্রোঞ্জ জিততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু কলকাতার এই হেভিওয়েট মাস্টার্স টুর্নামেন্টে মোটামুটি ভালো

খেলেও একটুর জন্য যোগ্যতা পেলেন না লন্ডন যাবার।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধি অনীশ গিরি এক অসামান্য প্রতিভা। কলকাতা পর্বে তার কিছু কিছু মুভমেন্ট দেখে অন্যতম প্রধান সংগঠক তথা প্রাক্তন তারকা গ্রান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া পর্যন্ত হতচকিত হয়ে যান। দিব্যেন্দু কথায় কথায় জানালেন অনীশ পারেন কার্লসেনকে হারিয়ে বিশ্বখেতাব মাথায় তুলতে। এখানে খেলে যাওয়া ইউক্রেনের লেভল অ্যারোনিয়ানকেও দিব্যেন্দু ভবিষ্যতে বিশ্বজয়ী হিসেবে মনে করেন। তবে স্বয়ং কার্লসেন বলে গেলেন ইতালির কাবিয়ানো কারুরানা যাকে হারিয়ে গত বছর এই সময় পঞ্চমবার বিশ্বজয়ী হয়েছিলেন সেই কারুরানাই তার প্রধান বাজি, তাকে খেতাব ও দাবার সিংহাসন চ্যুত করার ক্ষেত্রে।

কার্লসেন কিন্তু যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল বিশ্বনাথন আনন্দের প্রতি। খেলার অবকাশে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেই দিলেন এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও আনন্দের সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী বৈচিত্র্য তাকে মাঝে মধ্যেই বিস্মিত করে। ১৬-১৭ বছর বয়সে তার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দের সেকেন্ড বা প্র্যাকটিস পার্টনার হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সময় দাবার জটিল থিওরি আনন্দের জাদু থেকে শিখে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে নিজের খেলায় প্রয়োগ করেছেন এবং প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। তবে তাকে যদি টাইম মেশিনে চাপিয়ে অতীতে নিয়ে যাওয়া হয় তবে তিনি অবশ্যই খেলতে চাইবেন রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের দুই গ্রেট মাস্টার গ্রান্ডমাস্টার মিখাইল তাল ও ববি ফিশারের সঙ্গে।

এরা দুজন এবং অবশ্যই গ্যারি কাসপারভ অন্য গ্রহের গ্রান্ডমাস্টার। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার মাইক্রোসফটকে কাত করে দিয়েছেন গ্যারি এবং ভিসি। এদের কাজ থেকে মগজাস্ত্র ধার নিতে পারে বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা। আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যখনই কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে নামেন তখন কিন্তু কোনো চাপ অনুভব করেন না।

কলকাতা টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত রাউন্ডের খেলা অর্থাৎ প্রতিযোগিতার শেষ দিনে গ্যারি কাসপারভের আসার কথা ছিল। কিন্তু গ্যারি গ্লোবাল গ্রান্ড চেজটুরের আহ্বায়ক যেমন তেমনি নিজের দেশে প্রধান শাসক ভ্লাদিমির পুতিনের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী। তার দল রাশিয়ার প্রধান বিরোধী দল। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য ইচ্ছে থাকলেও কলকাতায় আসতে পারলেন না। তবে প্রধান সংগঠক দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে কথা দিয়েছেন আগামী বছর সব কাজ ফেলে অবশ্যই কলকাতায় আসবেন এবং পাঁচদিনই থাকবেন। কমিউনিস্ট দেশের মানুষ হলেও গ্যারি কাসপারভ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কলকাতায় এসে বেলুড়মঠ, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখবেন। পূর্বতন রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে মঠ-মিশনের বিখ্যাত তাত্ত্বিক সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সুসম্পর্কের কারণে সেদেশে শাখা বিস্তার করতে পেরেছে রামকৃষ্ণ মিশন। সে সময় গ্যারি কাসপারভ বিশ্ব দাবায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ চ্যাম্পিয়ন। আর তখন থেকেই ভারতীয় দাবা শক্তিশালী হতে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে। ■

মুখোমুখি আনন্দ এবং কার্লসেন।

# পরীক্ষা

ভবনাথ গার্লস হাইস্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্রী মিমি। সামনেই ওর বার্ষির পরীক্ষা। তাই মায়ের বকুনিতে আজ সারাদিন পড়তে হয়েছে মিমিকে। পড়তে পড়তে বিকেল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পড়ায় তার মন বসছে না। ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুঁতেই চঞ্চল হয়ে উঠল মিমি। এখন ওর খেলার সময়। রোজ এসময় ও খেলতে বেড়ায়। পরীক্ষার জন্য ওর বয়সি কেউ এখন খেলতে আসে না। সকলেই পড়াশোনা করে। মিমির মা ওকে পড়তে বসতে বলে, কিন্তু বাবার কাছে কান্নাকাটি করায় বিকেলে এক ঘণ্টা খেলার অনুমতি মিলেছে। এতে অবশ্য মায়ের সঙ্গে বাবার একচোট হয়ে গিয়েছে। মা বলেছে মিমির বয়সি মেয়েরা যখন সবাই এসময় পড়াশোনা করছে তখন ওকে এত আশকারা দেওয়া কেন? আর এতক্ষণ খেলাধুলা করলে পরীক্ষার রেজাল্ট নিশ্চয় খারাপ হবে ওর। তার জন্য বাবাই দায়ী থাকবে। মিমি কিন্তু প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়। তবু মা যে কেন তার খেলতে যাওয়ায় আপত্তি করে তা মিমি বুঝতে পারে না।

রোজ মিমি বাইরে বেরিয়ে প্রথনেই ডাক দেয় তার আদরের ভুলু আর পুষিকে। এছাড়াও আসে ময়না, টিয়া, শালিক, চড়ুই, কাক, বুলবুলি ও কাঠবেড়ালিরা। ওদের খেলায় যোগ আরও অনেকে— এপাড়ার আম, জবা, শিউলি, পেয়ারাগাছটা, আর ওপাড়ার কৃষ্ণচূড়া, গাঁদা আর কদমের চারারা। এদের খুব যত্ন করে মিমি। মাকে লুকিয়ে আদর করে ভুলু আর পুষিদের বিস্কুট, রুটি খাওয়ায়। সবার সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন যে একঘণ্টা পেরিয় যায় সে খেয়াল থাকে না মিমির। মায়ের ডাকে একরাশ দুঃখ নিয়ে ফিরতে হয় বাড়িতে। তারপর অপেক্ষা আবার পরের দিনের। ভুলুদের সঙ্গে খেলত দেখলে মা ওকে খুব বকাবকি করে। কখনও কখনও এর জন্য চড়-থাপ্পড়ও খেতে হয়েছে। মা বলে কুকুর বেড়াল আর গাছের সঙ্গে কীসের খেলা? তার চাইতে পড়তে বসা অনেক ভালো। কিন্তু মা কিছুতেই বোঝে না মিমির মন। ওদের সঙ্গে না খেললে পড়ায় যে কিছুতেই মন বসে না।

আজ মিমি বই খুলে বসে খেলার সঙ্গীদের কথাই ভাবছে। ওরা এখন কী করছ? নিশ্চয়ই তার অপেক্ষায় আছে। মা যে কেন বোঝে না সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকা ঠিক নয়। দাদু তো কতবার মাকে বুঝিয়েছে 'কেবল বই পড়ে নয়, প্রকৃতিকে জানতে, বুঝতে আর উপলব্ধি করতে পারলে তবেই প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়।' তবু যে মা কেন তার কথা বোঝে না.....

এসব ভাবতে ভাবতে জানালার বাইরে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল মিমি। তাকিয়ে দেখে জানালার বাইরে থেকে ওরই বয়সি একটা ছেলে হাত নাড়িয়ে ডাকছে। মা একটু বাইরে যাওয়ায় লুকিয়ে বেরিয়ে আসাটা একটু সহজ হলো মিমির। কাছে আসতেই ছেলেটা বলল— চলো আজ তোমায় পৃথিবীর করুণ রূপ দেখাবো। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল ওরা। কথায় কথায় জানতে পারল ছেলেটার নাম বিশ্ব। এমনিতে ওর কেউ নেই। সারাদিন এদিক ওদিক বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ফলমূল যা পায় তাই খেয়ে রাতটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। প্রকৃতিকেই ও মা বলে জানে। বিশ্বর কথা যত শুনছিল তত অবাক হচ্ছিল মিমি। বিশ্বর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও নিজের সঙ্গে একটা বড়ে মিল খুঁজে পেল সে।

বেশ খানিকটা হাঁটার পর থামল বিশ্ব। মিমি এদিকটা আগে কখনও আসেনি। ও বিশ্বর ইশারায় ডানদিকে তাকিয়ে দেখল বহু লোক মিলে কী সব যন্ত্রপাতি দিয়ে নির্বিচারে একের পর গাছ কেটে চলেছে। গাছ কেটে ফাঁকা করা জায়গায় বড়ো বড়ো বাড়ি গড়ে তুলছে। পাশেই বিশাল একটা কারখানার চিমনি দিয়ে গল গল করে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশে মিশছে। এমন বিষাক্ত ধোঁয়া বহু গাড়ি থেকেও বেরুচ্ছে।

কারখানার বর্জ্য ও মানুষের ব্যবহৃত প্লাস্টিকে পাশের নদী ও পুকুর ভরে গেছে। জলাশয়গুলিতে মাছ মরে ভসে উঠেছে। বিশ্ব বলে চলেছে লোভের জন্য মানুষ নিষ্ঠুরভাবে পশুপাখি মারছে। পশুর শিং, চামড়া এবং পাখির পালক দিয়ে শৌখিন জিনিস বানিয়ে বিক্রি করছে। মানুষ অবুঝের মতো নৃশংস হয়ে মেতে উঠছে এক বিশ্রী ধ্বংসলীলায়।

মিমি এসব দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে ডুকরে কঁদে উঠল। বিশ্ব ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল— ''এভাবে চলতে থাকলে আর কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে আর সেই সঙ্গে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ শেষ হয়ে যাবে। এরজন্য দায়ী থাকবে মানুষরাই। বোকা মানুষ নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে। এই অবস্থায় একমাত্র আমরা ছোটোরাই পারি এই সুন্দর পৃথিবীকে বাঁচাতে। এজন্য লাগতে হবে প্রচুর গাছ, বন্ধ করতে হবে প্লাস্টিকের ব্যবহার, থামাতে হবে নির্বিচারে প্রাণীহত্যা। প্রয়োজনীয় বস্তুর অপব্যবহর ও অপচয় রোধ করতে হবে। এই সুন্দর পৃথিবীকে বাঁচানোই আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। আর আমি জানি আমরা এই পরীক্ষায় সফল হবোই। কারণ কাজটা খুব বড়ো হলেও কঠিন নয়। ছোটো-বড়ো সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এই বার্তা....।''

এমন সময় মায়ের ডাকে জেগে উঠল মিমি। মনে পড়ল ও পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য মা ওকে খুব বকতে শুরু করেছে। কিন্তু মিমির কানে কিছুই ঢুকছিল না। বিশ্বর কথাগুলোই ওর মাথায় ঘুরছিল। ও শুধু ভাবছিল এই পৃথিবীকে বাঁচাতেই হবে তাকে। জীবনের এই বড়ো পরীক্ষায় তাকে সফল হতেই হবে।

**রূপসা দেবনাথ**

## ভারতের পথে পথে

# বৈজনাথ

কৌশানি থকে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে হিমালয়ের কোলে গোমতীর তীরে কাত্যুরীরাজদের ১১ শতকের পার্বতী মন্দির বৈজনাথে। কথিত, বনবাসকালে পাণ্ডবরা মন্দির তৈরি করে পূজা করেন দেবীর। ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, ভারতের একমাত্র পার্বতী মন্দির গরুড় উপত্যকায় ১২৩৪ মিটার উঁচু বৈজনাথে। কারুকার্যময় কাঠের দরজা-জানালা, কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজা অনিন্দ্যসুন্দর প্রশান্ত দেবীমূর্তির মন্দির রয়েছে আরও আটটি। শিব ,গণেশ ছাড়াও নানান বিগ্রহ রয়েছে। জনশ্রুতি, মহাদেব শিব হিমালয়-কন্যা পার্বতাকে বিয়ে করেন গোমতী ও গরুড়গঙ্গার সঙ্গমস্থল বৈজনাথে। কাত্যুরীরাজ বংশের পত্তন হয় শিব-পার্বতীর পুত্র কার্তিকেয়র থেকে। বিদেশি মুসলমান শাসকরা বারে বারে এখানকার মন্দির ভেঙেছে। লুণ্ঠিত হয়েছে মন্দিরের ধনরত্ন। এখানে দিগন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা। রংবেরঙের পাথরখণ্ড ও সিড়ি নেমেছে গোমতীতে। এখানে স্নানে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। আট কিলোমিটার দূরে রয়েছে কালীমন্দির।

## জানো কি?

- ১২ জানুয়রি—জাতীয় যুব দিবস।
- ১৫ জানুয়ারি—সেনা দিবস।
- ২৮ ফেব্রুয়রি—জাতীয় বিজ্ঞান দিবস।
- ৮ মর্চ—অন্তর্রাষ্ট্রীয় মহিলা দিবস।
- ২১ মার্চ—বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস।
- ২৪ মার্চ—বিশ্ব যক্ষা প্রতিরোধ দিবস।
- ৫ জুন—বিশ্ব পরিবেশ দিবস।
- ৫ সেপ্টেম্বর—শিক্ষক দিবস।
- ৮ সেপ্টেম্বর—বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস।
- ১৪ নভেম্বর—শিশু দিবস।

## ভালো কথা

# রাজু জোকার

জলপাউগুড়ি শহরের রাজু জোকারকে কে না চেনে? বছর পঞ্চাশের রাজুবাবু এমনিতে টিভি সারাইয়ের কাজ করেন। ফাঁকা সময় বহুরূপী সেজে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আনন্দ দান করে থাকেন। কখনো চার্লি চ্যাপলিন, কখনো একই শরীরে একদিকে হিন্দু, অন্যদিকে মুসলমান সেজে মানুষকে সম্প্রীতির বার্তা দেন, কখনো প্রধানমন্ত্রী সেজে রাজার মতো হাঁটতে থাকেন। রাজুবাবুর আসল নাম সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বহুরূপী সেজেই রাস্তায় মানুষের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক কুড়িয়ে কুড়িয়ে বড়ো থলেতে জমা করেন আর চিৎকার বলতে থাকেন এই প্লাস্টিক আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। প্রকৃতি ও পরিবশকে বাঁচাতে গেলে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে। গত ২ অক্টোবর দিল্লির রাজপথে তিনি মোদী সেজে প্লাস্টিক কুড়োতে কুড়োতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন। জলপাইগুড়ির মানুষ তাঁকে দিল্লি থেকে ফেরার পর সংবর্ধনা দিয়েছে। রাজুবাবু একজন সমাজসেবী। তিনি গরিবদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

**তৃষা ভৌমিক,** একাদশ শ্রেণী, রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

# শীতের ফন্দি

**সুমন রাজোয়ার,** সপ্তম শ্রেণী, জয়পুর, পুরুলিয়া।

আসছে আসছে করেও
আসছে না যে ভাই,
পৌষমাস এসে গেল
আনন্দ নেই যে নাই।

নতুন কেনা সোয়েটার
বাকসে আছে বন্দি
রোদের তাপও বেজায় কড়া
কী যে শীতের ফন্দি।

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# ।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৭।।

প্রখ্যাত বিপ্লবী রাজগুরুকে পথনির্দেশ।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে ডাক্তারজীর দেখা হলো।

ইয়তমল জেলা সফরে গিয়ে ডাক্তারজী পুসদ পৌঁছলেন। পথে গোরু কাটতে উদ্যত কসাইকে দেখে ডাক্তারজী রুদ্ররূপ ধারণ করলেন। গোরুটাকে তুলে দিলেন গোরক্ষা সমিতির হাতে।

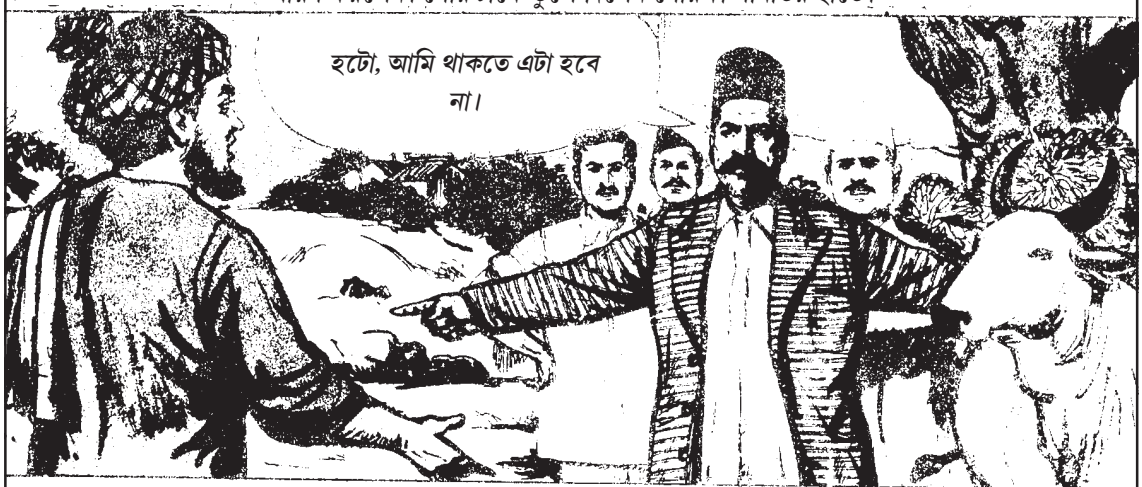


১৯৩০ সালে দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলল। ডাক্তারজী সোৎসাহে তাতে যোগ দিলেন। ১৯৩০ সালে জুলাইয়ে তিনি নিজের দলবল নিয়ে ইয়তমলের কাছে জঙ্গল সত্যাগ্রহ করলেন।

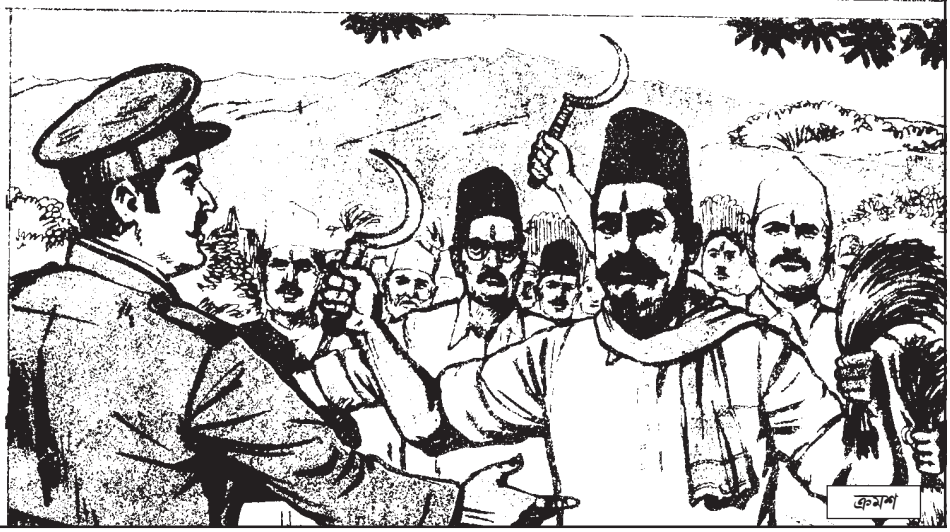

# নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন
# ভারতীয় সংবিধান ও আইনের প্রেক্ষাপটে

**বিমল শঙ্কর নন্দ**

একটি দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে অধিকার ভোগ করবে কে? রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর মূল দাবি কার? এ নিয়ে বিতর্ক আজকের নয়। শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত থেকেই এই বিতর্ক চলছে। নাগরিকতা এক ধরনের আইনগত মর্যাদা, তা অর্জন করলে ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন করার, ভোগ করার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা পালন করার সুযোগ পায়। এ কারণে নাগরিকতাকে বলা হয় 'অধিকার অর্জনের অধিকার' (right to have rights)। নাগরিকতা বিষয়টি নিছক আইনগত বিষয় নয়। কেবল আইনগত বা সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নাগরিকতার তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা অসম্ভব।

দেশের সমস্ত অধিবাসী নাগরিক হতে পারে না, নাগরিকদের সঙ্গে অ-নাগরিকদের অধিকারগত এবং মর্যাদাগত পার্থক্য আছে— এই ভাবনা প্রথম দেখা যায় গ্রিক নগররাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শনে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। গ্রিক নগররাষ্ট্র বা city state যেগুলিকে গ্রিকরা পোলিস (polis) নামে অভিহিত করতো সেখানকার সমাজের শ্রেণীভিত্তিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল তিনটি জনগোষ্ঠীর স্তরের উপস্থিতি নিয়ে। সমাজ কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ক্রীতদাস বা slave। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ইউরোপের সর্বত্রই দাস প্রথার প্রচলন ছিল। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ মনে করতেন একটি পরিবার গড়ে ওঠে নারী, পুরুষ ও ক্রীতদাসকে নিয়ে। গ্রিক সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে ছিল নগররাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশি বা matics। বিদেশি হওয়ার কারণে এদের কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারতো City-state-এ বসবাসকারী citizen বা নাগরিকরা। এরা জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার একমাত্র অধিকারী। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর Politics গ্রন্থে নাগরিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তৎকালীন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে বলেছেন, সরকারি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকেই কেবল নাগরিক বলা যাবে।

হাওড়ায় বাসে আগুন।

প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রেই কেবল নাগরিক এবং তার অধিকার নিয়ে ভাবনা ছিল না, প্রাচীন রোমানরাও নাগরিকতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী জুড়ে দীর্ঘ দুশো বছর ধরে অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের যে দ্বন্দ্ব চলছিল (conflict between Patricians and Plebeians) তার নিরসন ঘটে উত্তম শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এই বোঝাপড়ার ফল হলো পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের সমতার ভিত্তিতে এক অভিন্ন রোমান নাগরিকত্বের প্রতিষ্ঠা। রোমানরা পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল দখল করেছিল। বিজিত অঞ্চলের মানুষদের মর্যাদা কী হবে সে নিয়েও রোমানরা ভাবনাচিন্তা করেছে। তবে সে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরিসর এখানে নেই।

সুতরাং নাগরিকতা বিষয়টির গুরুত্ব এবং এনিয়ে ভাবনাচিন্তা বহু পুরানো। দেশে শাসন ব্যবস্থা যখন প্রায় ভ্রূণাবস্থায় তখন থেকেই নাগরিকতা নিয়ে ভাবনাচিন্তা, বিতর্ক চলছে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশ তার নাগরিকতা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সেগুলো গড়ে তোলা হয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। দেশের নাগরিকতার প্রকৃতি তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত দ্বারাই বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। ভারতীয় নাগরিকতা আলোচনা করার সময় তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে ভুলে গেলে চলবে না। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দুর্ভাগ্যজনক দেশভাগ যার অভিঘাত ভারত এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মানুষ ভারতে চলে আসেন। দীর্ঘদিন ধরে এই দুটি অঞ্চল থেকে এই মানুষদের ভারতে আসার সম্ভাবনাও ছিল। এইসব বিষয়গুলি ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের মাথায় রাখতে হয়েছিল। ফলে ভারতীয় নাগরিকতা বিষয়ে কোনো স্থির ও স্থায়ী সিদ্ধান্তে তাঁরা আসতে পারেননি। এ কারণে সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ড. বি. আর আম্বেদকার গণপরিষদে

ফঃ ৬

বলেছিলেন যে, ভারতের নাগরিকত্বের ব্যাপারে তাঁরা কোনো স্থায়ী ও সম্পূর্ণ বিধিবিধান তৈরি করতে যাচ্ছেন না। গণপরিষদের উদ্দেশ্য হলো সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার প্রাক্কালে কারা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন তা নির্ধারণ করা, নাগরিকতা সম্পর্কে স্থায়ী নিয়মকানুন প্রণয়নের সামগ্রিক ক্ষমতার অধিকারী হবে ভারতের সংসদ। সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপের ব্যাপারে নিয়মকানুন ও পন্থা পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ভারতীয় সংসদ ১৯৫৫ সালে ভারতীয় নাগরিকতা আইন, ১৯৫৫ (Indian Citizenship Act, 1955) প্রণয়ন করে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান হলেও নাগরিকতা সম্পর্কে কোনো বিশদ আলোচনা এখানে নেই। ভারতীয় সংবিধানের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী এ বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতাবলে ভারতীয় সংসদ Indian Citizenship Act, 1955 পাশ করে এবং বার বার এই আইনটি সংশোধিত হয়েছে। এর আগে ১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩, ২০০৫ এবং ২০১৫ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন সংশোধিত হয়েছে। ২০১৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর লোকসভায় এবং ১১ই ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। ১২ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বিলটিতে সম্মতি দেওয়ায় তা আইনে পরিণত হয়। এবং এটি ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী হিসাবে সেই আইনের অঙ্গীভূত হয়েছে। সুতরাং সংবিধানের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী নাগরিকতার বিধিনিয়ম প্রণয়নের যে ক্ষমতা ভারতীয় সংসদের আছে সংসদ সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করেছে।

ভারতীয় নাগরিকতা বিষয়ক সাংবিধানিক সংস্থানগুলি ভারতীয় সংবিধানের ৫ থেকে ১১ ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী সংবিধান চালুর সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দারা সকলে ভারতের নাগরিক হবেন যদি তাঁরা ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, বা তাঁদের মাতা-পিতার কেউ একজন ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। সংবিধানের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত আগে যারা অন্তত পাঁচ বছর ধরে ভারতে বসবাস করে আসছেন তাঁরা যদি স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে তাঁরা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য হবেন। সংবিধানের ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ধারাগুলিতেও স্বাধীনতা ও দেশত্যাগের প্রেক্ষাপটে সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার সময় কারা ভারতের নাগরিক হতে পারেন তার উল্লেখ আছে।

কিন্তু ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এটা বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতে নাগরিকতার বিষয়টি বার বার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে এবং ভারতীয় সংসদকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হতে পারে। তাই সংবিধানের ১১ নম্বর ধারায় সংসদের হাতে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই ক্ষমতাবলে ভারতীয় পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালে যে ভারতীয় নাগরিকতা আইন প্রণয়ন করেছে পরিস্থিতিরি প্রয়োজনে তাকে বার বার সংশোধন করতে হয়েছে। ২০১৯ সালে যে নাগরিকতা আইন, ১৯৫৫ সংশোধিত হলো তাকে এই প্রেক্ষাপটেই বিচার করা প্রয়োজন। ২০১৯-এ সংশোধিত আইন অনুযায়ী ২০১৪-এর ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই তিনটি ইসলামিক দেশ থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান বা পার্সি ধর্মের মানুষজন ভারতীয় নাগরিকতার সুযোগ পাবেন। রাজ্যসভায় বিলটি পাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে 'সমবেদনা ও সৌভ্রাতৃত্বের যে সংস্কৃতি আমাদের রয়েছে এই বিলটি তার মাইলফলক।' মূলত ধর্মীয় বা সংশ্লিষ্ট কারণে এই দেশগুলিতে নিপীড়িত সংখ্যালঘু মানুষ এই সংশোধনীর ফলে এদেশে মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবেন। এর আগেও ভারতীয় সংসদে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে যে সংশোধনী এনেছে তাতে নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রটিকে বাড়ানো হয়েছে। ২০১৯-এর সংশোধনী সেই ক্ষেত্রটিকেই আর একটু বৃদ্ধি করেছে। অনেক সময় বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করতে ভারত সরকার ১৯৫৫ সালের আইন সংশোধন করে। ১৯৬৪ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। সে চুক্তি অনুযায়ী ভারত প্রায় ৫,২৫,০০০ তামিলভাষী মানুষকে এদেশে ফিরিয়ে এনে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বিদেশ থেকে আসা মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদানের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে।

এই সংশোধনী নিয়ে একটি প্রশ্ন বারবার উঠেছে। এই সংশোধনী কি সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় সন্নিবিষ্ট সাম্যের অধিকারের বিরোধী? এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে মামলা দায়ের হয়েছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট হলেন সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দু'একটি উক্তি করা যায়। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার মূল বিষয় হলো 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'। এই আইন কেবল ভারতের নাগরিকদের জন্য, অন্যদেশের নাগরিকের জন্য নয়। আইভর জেনিংস-এর মতে 'সমপর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য আইন হবে একই প্রকার এবং একইভাবে প্রযুক্ত হবে।' চিরঞ্জিত পাল চৌধুরী বনাম ভারত সরকার (১৯৫১), সতীশচন্দ্র বনাম ভারত সরকার (১৯৫৩) মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, একই পরিস্থিতি বা অবস্থায় অবস্থিত সকল ব্যক্তি সমভাবে আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হবে। ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-তে সংশোধন করতে গিয়ে ২০১৯ এবং সংশোধনী আইন যে তিনটি দেশের উল্লেখ করেছে সেই পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ ঘোষিতভাবেই মুসলমান দেশ। ইসলাম এদের রাষ্ট্রধর্ম। সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে অ-মুসলমানদের একই সুযোগ সুবিধা আছে তা কি বলা যায়? এই দেশগুলিতে বিগত ৭০ বছরে অ-মুসলমানদের সংখ্যা এভাবে হ্রাস পেয়েছে কেন? ধর্মীয় কারণে জীবন, জীবিকা, কিংবা নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হওয়ার অভিযোগ (বিশেষত পাকিস্তানে) বার বার ওঠে কেন? ভারতীয় সংবিধানে পৃথকীকরণের সংস্থান আছে। তবে তাকে যুক্তিসংগত হতে হবে। ২০১৯-এর সংশোধনীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান কিংবা পার্সি ছাড়া অন্য কাউকে ২০১৪-এর ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিবর্ষ ধরে নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই পৃথকীকরণ কোনোভাবেই অযৌক্তিক নয়, বরং অনেক বেশি যুক্তিসংগত। অন্তত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। ■

# নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল শরণার্থীদের জন্য এক উজ্জ্বল প্রভাত

**অমিত শাহ**

আমরা যখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সংসদে উপস্থিত করেছিলাম, তখনই আমরা বলেছিলাম এই বিলটি সেই বিপর্যস্ত শরণার্থী বন্ধুদের কষ্টলাঘব করার জন্যই তৈরি। এই বিলটি প্রস্তুত করার পর থেকে সংসদে পেশ করা পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিলটিকে নিয়ে চর্চা করেছেন এবং বারবার তারা বলেছেন এই বিলটি ভারতীয় সংবিধানের ধারা ১৪ উলঙ্ঘন করেছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বারবার বলছি এই বিলটি প্রস্তুত করার এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সমস্ত শরণার্থীর যাতনাপূর্ণ নরকযন্ত্রণার অবসান ঘটানো। আমি আজ খুব আনন্দিত যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যারা ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের দেশে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব তথা সংবিধানিক সম্মান দেওয়ার কাজ আমরা এই বিলের মাধ্যমে করতে চলেছি। যখন এই বিলটি সংসদে পাশ হয়ে যাবে এই নরকযন্ত্রণা থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারব। এই বিলটির সম্বন্ধে অনেক অপপ্রচার ও ভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আমি চাই না এই সদনে চর্চার মাধ্যমে ভারতবর্ষের কোনো স্থানে কোনো রূপ ভ্রান্তি প্রচারিত হোক। আমি আপনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সংসদকে এবং সংসদের মাধ্যমে সারা দেশকে এটা জানিয়ে দিতে চাই যে কোনো অবস্থাতেই এই বিল অসাংবিধানিক নয়। চর্চা চলাকালীন অনেক সাংসদই বলেছেন, এই বিলটি ধারা-১৪-কে উলঙ্ঘন করেছে। ধারা-১৪-তে যে সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে আইন বানালে উলঙ্ঘন হয় না। এটাকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের পুরানো ইতিহাসে যেতে হবে তাহলেই আমরা বুঝতে পারব কেন এই বিল অসাংবিধানিক নয়।

যদি এই দেশের বিভাজন ধর্মের ভিত্তিতে না হতো, তাহলে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এই কঠোর বাস্তব সত্যটিকে সংসদে উপস্থিত সমস্ত সদস্যকে মেনে নিতে হবে। আপনি এটিকে স্বীকার না করে ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে পারবেন না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে যে স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই স্থান পাকিস্তান নামে পৃথক দেশে হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এবং বাকি অংশ ভারত হিসেবে রয়ে যায়। পরে পাকিস্তান ভেঙে পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর মাঝখানে একটি বিভীষিকা এসেছিল যার মধ্য দিয়ে দুই দেশে শরণার্থীরা মারদাঙ্গা, লুট, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন— বহু পরিবার এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করেছেন। কিন্তু এর পরে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে ১৯৫০ সালে দিল্লিতে এটি ঠিক হয় যে দুইদেশ নিজের সংখ্যালঘু বাসিন্দাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আমি এইসব বর্ণনা করছি শুধুমাত্র এই জন্যই যে এই বিলটির পৃষ্ঠভূমি হলো এই ঘটনার প্রভাব। সেই সময় দুইদেশের সরকার পরস্পরকে কথা দিয়েছিল যে সেই দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি এদের সংরক্ষণ করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তি শুধু খাতাকলমেই

সীমাবদ্ধ ছিল।

যে তিন দেশের সংখ্যালঘুদের আমাদের দেশে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে ঠিক করেছি সে বিষয়ে সংবিধান নিয়ে একটু চর্চা করতে চাই এবং তাদের বর্তমান স্থিতি আপনাদের জানাতে চাই। আফগানিস্তান তাদের ধর্ম 'ইসলামিক অব আফগানিস্তান' অর্থাৎ ওখানে ইসলামকে ওই রাজ্য ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান-'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজ্য ধর্ম হলো ইসলাম। বাংলাদেশ যখন তৈরি হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল কিন্তু ১৯৭৭ এবং ১৯৮৮ সালে বদল করে রিপাবলিক অব ইসলাম করে দেওয়া হয়েছে। এই তিন দেশেরই ধর্ম ইসলাম। ওদের সংবিধানে তা লেখা আছে। এই তথ্যগুলি দেওয়া জরুরি, কারণ এর থেকেই জানা যায় ওই দেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা।

এই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ঘটনাবহুল ইতিহাসে পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে সংখ্যালঘুরা ২৩ শতাংশ ছিল যেটি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০১১-তে এসে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র ৩ শতাংশ। পূর্ববঙ্গে ছিল ২২ শতাংশ, ২০১১-তে হয়ে দাঁড়াল ৭.৮ শতাংশ। কোথায় গেলেন এঁরা? হয়তো তাঁদের ধর্ম পরিবর্তন হয়ে গেছে নয়তো তাদের মেরে ফেলা হয়েছে অথবা ভারতে পালিয়ে এসেছেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁদের, কী দোষ ছিল ওই দেশের সংখ্যালঘুদের তাঁদের জীবনকে নরকে পরিণত করা হয়েছিল? আমরা চাই তাদের অস্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁরা জীবনযাপন করুক।

অনেকেই বলেছেন যে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করার চেষ্টা চলছে। ভারতের সংবিধান পক্ষপাতী হয়ে উঠছে। আমি আপনাদের জানাতে চাই ভারতে হয়েছে কী? ভারতে ১৯৫৯ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। ২০১১ সালে হয়েছে ৭৯ শতাংশ। এখানে সংখ্যা বাড়েনি কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা ১৯৫৯ সালে ছিল ৯.৮ শতাংশ, এখন ১৪.২৩ শতাংশ। আমরা কারো সঙ্গে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদভাব করিনি। এবং ভবিষ্যতেও ধর্মের ভিত্তিকে কোনো ভেদভাব হবে না। কিন্তু প্রতিবেশী দেশে ধর্মের ভিত্তিতে তখনকার সংখ্যালঘু বাসিন্দাদের সঙ্গে অত্যাচার, প্রতারণা হলে ভারত সরকার মূক দর্শক সেজে বসে থাকবে না। তাদের বাঁচানোর জন্য যা-যা করণীয় তা করবে। তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এই জন্য আমি আবার ধারা ১৪-র কথা বলব, যেখানে বলা হয়েছে সমান অধিকার খর্ব হয় এমন নিয়ম- কানুন সংসদ বানাতে পারবে না। কিন্তু এখানে কোনো বিশেষ ধর্মের জন্য হচ্ছে না, হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য, সংখ্যালঘু শরণার্থীর জন্য যার মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি এরা সবাই আছেন। শুধু একটি বিশেষ ধর্মের জন্য হলে ধারা উলঙ্ঘন হতো। কিন্তু এটি হচ্ছে প্রতারিত সংখ্যালঘু শ্রেণীর সংরক্ষণের জন্য তাই সেখানে ধারা ১৪ খর্ব হচ্ছে না। এমন অনেক নিয়ম আইন আছে যেখানে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আলাদা আইন তৈরি করা হয়েছে, সেখানে কি ১৪ ধারা উলঙ্ঘন করা হয়নি? কিন্তু এই বিলে কোনো ধর্মের প্রতি ভেদভাবের সম্পর্ক নেই। এই বিল আনা হয়েছে কেবল তিন দেশের প্রতারিত সংখ্যালঘু শরণার্থীদের জন্য। তারা শরণ নেওয়ার জন্য এসেছেন। তারা অনুপ্রবেশকারী হতে পারেন না। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসেছেন।

এই বিল ভারতীয় সংবিধানের কোনো ধারাকে উলঙ্ঘন করে না। সংবিধানের দৃষ্টিতে এই বিল সম্পূর্ণ সঠিক। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন ভারত সরকার ইউ এন কমিশনের চুক্তি অনুযায়ী কোনো রিফিউজি পলিসি তৈরি করেছে কিনা? তাদের স্পষ্ট জানাতে চাই আমরা কোনো আইন তৈরি করছি না— আমাদের সংবিধান স্বয়ং সম্পূর্ণ।

যখন পার্সি সম্প্রদায় ইরান থেকে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতারিত হয়ে ভারতে এসেছিল ভারত শরণ দিয়েছিল। আজও ধর্মের ভিত্তিতে প্রতারিত শরণার্থীদেরই এখানে সম্মানের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা আমরা করতে চলেছি। একজন ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনকে বাঁচাতে ভারতে আসতে হয়। আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে গ্রহণ করা, সংরক্ষণ করা।

মনীষ তেওয়ারি বলেছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা সাভারকর দিয়েছেন, এই তর্কে আমি যেতে চাই না। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্না দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার প্রসার করায় দেশ বিভাজন হলো। আপনারা কংগ্রেসের সদস্য সেই বিভাজনকে স্বীকার করলেন কীভাবে? তাকে আটকানো হয়নি কেন?

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন এই দেশে যদি বিভাজন হয় আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে। ওদিকে কংগ্রেস পার্টি ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া দেশ-বিভাজনে সায় দিয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনে কংগ্রেসের মত ছিল কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

দয়ানিধি মারান প্রশ্ন করেছেন, পাকিস্তান


*রাষ্ট্রায় স্বাহা, রাষ্ট্রায় ইদং ন মম*

## গ্রাম বিকাশের জন্য একবছর সময় দান করুন

আমাদের সংস্থা গ্রাম বিকাশের দ্বারা গো-ভিত্তিক জৈবিক কৃষিকাজ, বর্ষার জল সংগ্রহের ডোবা খনন, বাড়ি বাড়ি তরিতরকারি ও ফলের বাগান তৈরি, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রামোদ্যোগের মাধ্যমে রোজগার ইত্যাদি গতিবিধি চলছে।

একটি গোরুর গোবর-গোমূত্র থেকে ৫ একর জমিতে কৃষিপদ্ধতি শেখানো, গ্রামীণ উৎপাদন বিক্রির ন্যায্যমূল্য পেতে সহযোগিতা করার কাজও গ্রামবিকাশের মাধ্যমে চলছে।

**পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে এই জ্ঞান-আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রেমী, গো-প্রেমী, সেবা-ভাবী যুবক-যুবতীদের আহ্বান করা হচ্ছে, যারা বাড়ি ছেড়ে ন্যূনতম এক বছর সময় এই মহৎ কাজের জন্য দান করবেন।**

এই বিষয়ে পথনির্দেশ, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সংস্থার দ্বারা করা হবে। বয়সসীমা ৩৫-৫০ বছর।

সম্পর্ক সূত্র—

**গো-গ্রাম বিকাশ**

Mobile : 8100330044

E-mail : gosevaparivar@gmail.com

অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ হিসেবে মানলেও আমরা নাকি সেখানের বাসিন্দাদের ভারতীয় নাগরিক বলে মানি না। তার উত্তরে আমি তাঁকে বলতে চাই। পাক অধিকৃত কাশ্মীরও আমাদের, সেখানকর বাসিন্দাও আমাদের। তাই ওখানের ২৪টি আসন বিধানসভা সংরক্ষিত আছে। বলা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের কেন নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। তার উত্তরে বলি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন বিভাজনের পরে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে আগতদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কা থেকে আগতদেরও দেওয়া হয়েছে। এইবার শুধুমাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন 'সংখ্যালঘু'র সংজ্ঞা নিয়ে। বলেছেন সংজ্ঞা সংকুচিত অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সাংবিধানিক ধর্ম ইসলাম, তাই সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদিদের এই বিলে ব্যবস্থা আছে। এর সঙ্গে এদেশের সংখ্যালঘুদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই দেশের মুসলমানদের সঙ্গে এই বিলের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন চিহ্ন প্রস্তুত হচ্ছে যেন এই দেশের মুসলমানদের সঙ্গে ভেদভাব করা হচ্ছে। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ হয়ে ভারতে আসে। মায়ানমার একটি সেকুলার দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ হয়ে ভারতে ঢুকছে। এদের কখনো স্বীকার করা হবে না।

কেউ কেউ বলছেন এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভয় পাচ্ছে। তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে কারো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এই সরকার সবাইকে সুরক্ষা ও সমানাধিকার দিতে প্রতিবদ্ধ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের উদাহরণ দিয়ে ভাষণ দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন, ওই মনীষীরা এই বর্তমান বাঙ্গলার কল্পনা করেছিলেন যেখানে সরস্বতী পূজা করার জন্য আদালতে যেতে হয়? তাঁর বক্তব্য এনআরসি ও ক্যাব হলো একটা ফাঁদ। মনে হচ্ছে কারণ বাঙ্গলার ভোটব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের শরণ দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই অভিসন্ধি সফল হতে দেব না। এই বিলের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থী নাগরিকত্ব পেতে চলেছেন। তারা বাঙ্গালি, তাই বাঙ্গলার বিপক্ষ সদস্যদের আমি জানাতে চাই এই অপপ্রচার চালাবেন না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী সমস্ত শরণার্থী নাগরিকত্ব পাবেন। তার জন্য কোনো বিশেষ কার্ডের প্রয়োজন নেই। সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে কাগজ থাক বা না থাক।

অধীর রঞ্জন চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেছেন এই বিল সাম্প্রদায়িক। সত্য এই যে তার পার্টি এতটাই অসাম্প্রদায়িক যে কেরলে তারা মুসলিম লিগের সঙ্গে এবং মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গে জোটবদ্ধ। আমি আমার জীবনে এত অসাম্প্রদায়িক পার্টি দেখিনি। তিনি বলছেন এই বিলের মধ্যে চীন, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার ইত্যাদি দেশের উল্লেখ নেই কেন? শুধুমাত্র পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ কেন? তার উত্তরে বলছি প্রত্যেকবার নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিলের ক্ষেত্রে এই তিন দেশের জন্য নির্ণয় করা হয়েছে বাকি দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯৫০ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুসারে নাগরিকত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

ওয়েসি বলছেন— এনআরসি-র পৃষ্ঠভূমি তৈরি করা হচ্ছে। তাঁকে বলা বলা হচ্ছে কোনো পৃষ্ঠভূমির প্রয়োজন নেই। এনআরসি হবেই। আরও বলেছেন যে, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা কেন? তাঁকে জানাতে চাই— আমাদের কোনো ঘৃণা নেই, তিনিও যেন কোনো ঘৃণার সূত্রপাত না করেন। আবারও আমি বলছি, এই বিলের সঙ্গে এদেশের মুসলমানদের কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্রী গগৈ বলছেন, সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আশা করি তিনি সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সদস্যদের ভাষণ শুনেছেন— সবাই বিলের সমর্থনেই বলেছেন। সিকিমের সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথার মধ্যে এবং এখানেও জানাতে চাই যে তাঁদের আইনেও কোনো বাধা ক্যাব দ্বারা হবে না। ৩৭১-এফ ধারার মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিন্তু শুনে নিন, সেখানে ইনার লাইন পারমিট দ্বারা সংরক্ষিত আছে। মণিপুরকেও ইনার লাইন পারমিট দেওয়া হবে। মণিপুর, অরুণাচল, মেঘালয়, অসম সিএবি-এর আওতার বাইরে থাকবে। প্রান্তস্তরে কোনো কারও চিন্তার কারণ নেই। মহারাষ্ট্র, বিহার, ওড়িশার মানুষ যারা সেখানে আছেন তাদের ভয়ের কিছু নেই।

লিয়াকত-নেহরু চুক্তি বিফলে যাওয়ার কারণেই এই তিন দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন আর তাদের এই দেশে চলে আসা। এবং আজ আমাদের এই সমস্যার সমাধানে এই বিল নিয়ে আসা। ১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ শিখ, হিন্দুদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গভীর ইতিহাস আছে। ইউ এন রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পাকিস্তানে শুধুমাত্র ২০টি ধর্মীয়স্থান অবশিষ্ট আছে। এটাই প্রমাণ করে ওখানকার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা।

১৯৭২ বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া শান্তি-মৈত্রী চুক্তি যেটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরই তাও ভেস্তে যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হ্রাস পায়। তারা শরণ নেওয়ার জন্য ভারতে এসেছেন।

সেরকমই আফগানিস্তানের হিন্দুরা তালিবানি অত্যাচারেই অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে এসেছেন, তাদের শরণ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তাদের প্রতিদিনের জীবন ছিল দুঃসহ। তাদের জোর করে ইসলাম মানার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হতো। অমুসলমান হওয়ার জন্য তাদের বিশেষ কাপড়ের ব্যবহার করা হতো। শুক্রবার নমাজ পড়তে হোক বা না হোক, মসজিদে যেতেই হতো। না হলেই দণ্ডিত হতে হতো।

তাদের স্বাধীন স্বাভিমানী জীবন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিল এনেছেন যাতে এরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় ও সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন।

আমার বিনীত নিবেদন, ভোটব্যাঙ্কের লালসায় অন্ধ হয়ে বসে না থেকে দেখুন। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারিত মানুষ রাস্তায় ও রেললাইনের ধারে বাস করছেন। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা নেই, থাকার জায়গা নেই। আমাদের সরকার এদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

আগামী প্রভাত এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য উজ্জ্বল প্রভাত হতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীজীর জন্য তাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

*(লোকসভায় অমিত শাহের ভাষণ।*
*অনুবাদক : সৌরভ সিংহ)*

# ভারত ও নেপালের মধ্যে চতুর্দশ যৌথ সামরিক মহড়া সূর্য কিরণের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** নেপালের রূপেনদিহাই জেলায় শালিঝান্ডির নেপাল আর্মি ব্যাটেল স্কুলে আয়োজিত ভারত ও নেপালের মধ্যে চতুর্দশ যৌথ সামরিক মহড়া 'সূর্য কিরণ' আজ শেষ হলো। ১৪ দিন ধরে চলে এই সামরিক মহড়া। পার্বত্য এলাকায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভারত ও নেপালের মধ্যে এই যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ, বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান, পরিবেশ সংরক্ষণ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মহড়া চলে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে। এছাড়াও জঙ্গল এলাকায় সন্ত্রাস দমন, দেশের সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল এই যৌথ সামরিক মহড়ায়। যৌথ মহড়া সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল গোপাল গুরু এবং নেপালের সেনাপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। সামরিক মহড়ার পাশাপাশি দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রীতি ফুটবল, বাস্কেট বল, ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

# ভারতের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ মহাকাশ যান পিএসএলভি-র ৫০তম সফল উৎক্ষেপণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ভারতের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ লঞ্চ ভেহিকল পিএসএলভি ৫০তম উৎক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে রিস্যাট-২ বি আর-১ এবং নয়টি বাণিজ্যিক উপগ্রহ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। দুপুর ৩টে ২৫ মিনিটে পিএসএলভি-সি-৪৮ মহাকাশ যানটি উৎক্ষেপণ করা হয়। এর ১৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড পর রিস্যাট-২ বিআর-১ মহাকাশ যানটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৫৭৬ কিলোমিটার দূরে কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপিত হয়। একইভাবে নয়টি বাণিজ্যিক উপগ্রহ সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। ইসরো বেঙ্গালুরু থেকে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করে। পিএসএলভি-র সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর চেয়ারম্যান ড. কে শিভান বলেন, এই ৫০তম সফল উৎক্ষেপণ ইতিহাসের এক মাইলফলক অর্জন করলো। এদিন 'PSLV@ 50' শীর্ষক একটি বইয়েরও উদ্বোধন করেন তিনি। ইসরোর চেয়ারম্যান আরও বলেন, ৫৫.৭ টন ওজন বিশিষ্ট বহুমুখী কর্মশক্তি সম্পন্ন এই মহাকাশ উৎক্ষেপণ যানটি মহাকাশে পাঠানো হয়েছে।

৬২৮ কেজি ওজন বিশিষ্ট রিস্যাট-২ বিআর-১ উপগ্রহটি নজরদারির কাজ করবে। পাশাপাশি কৃষি, বনাঞ্চল এবং বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে বিভিন্ন তথ্য জোগাবে এই উপগ্রহ। পাঁচ বছর কর্মক্ষমতা রয়েছে এই রিস্যাট-২ বিআর-১-এ উপগ্রহের। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উপগ্রহ নির্মাণ এবং উৎক্ষেপণের জন্য এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা ধন্যবাদ জানান ইসরোর চেয়ারম্যান। ইজরায়েল, ইতালি, জাপান এবং আমেরিকা নয়টি উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে এর সঙ্গে। এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সাক্ষী ছিলেন প্রায় ৭ হাজার দর্শক।

# কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী সরকারি, আংশিক সরকারি বা পূর্ণ আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা পরোক্ষভাবে সরকারি আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে যেখানে ১০ জনের বেশি কর্মী কাজ করেন, সেই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক। অভ্যন্তরীণ কমিটিতে দাখিল হওয়া অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার মতো কোনও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেই। তবে, ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক সেক্সুয়্যাল হ্যারাসমেন্ট ইলেকট্রনিক বক্স নামে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করেছে, যেখানে কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের ব্যাপারে মহিলারা অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। এ পর্যন্ত এতে ৭৫০টি অভিযোগ জমা পড়েছে যার মধ্যে ২২৭টি অভিযোগ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের।

# পরলোকে শালবাড়ির প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুরেন্দ্রনারায়ণ কোঙার

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ি গ্রামের প্রথম দিকের স্বয়ংসেবক সুরেন্দ্রনারায়ণ কোঙার গত ৮ ডিসেম্বর লোকান্তরিত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ পুত্র, সাত কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

তৎকালীন উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ প্রচারক প্রয়াত দেবব্রত সিংহ উত্তরবঙ্গে

দীর্ঘদিন সঙ্ঘকাজ করার সুবাদে বহু স্বয়ংসেবক তাঁর প্রেরণায় সঙ্ঘকাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সদাহাস্য, দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ সুরেনদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি তুফানগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্রদরদি ও জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। দেবুদার সান্নিধ্যে এসে তিনি স্বয়ংসেবক হন। ক্রমে ক্রমে তুফানগঞ্জ মহকুমা কার্যবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোচবিহার জেলায় রাজবংশী সমাজের মধ্যে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সঙ্ঘের কাজের বিস্তার ঘটে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে তিনি ১৯ মাস কারান্তরালে থাকেন। ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হলে তিনি কোচবিহার জেলা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে সংগঠনের ভিত্তি মজবুত করেন। তাঁর লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু স্বয়ংসেবক ও অসংখ্য গুণগ্রাহী তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

## মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন কার্যকর্তা অসীম কুমার মিত্রের পুত্র অর্ণব কুমার মিত্র ও পুত্রবধূ সায়ণী মিত্র তাদের পুত্র অর্ণীকের অন্নপ্রশন অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ক্ষেত্রীয় কার্যকর্ত্রী শ্রীমতী মহুয়া ধরের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ দ্বৈতচরণ দত্ত-সহ বহু কার্যকর্তা এবং সেবিকা সমিতির সেবিকা বোনেরা। উল্লেখ্য, শ্রীমান অর্ণীকের ঠাকুমা একজন প্রবীণা সেবিকা।

* * *

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের হুগলী জেলা সম্পাদক অনুপ দাস তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আদৃতার শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলা শারীরিক প্রমুখ সহ বহু কার্যকর্তা এবং ডাঃ শরৎ চন্দ্র সরস্বতী শিশুমন্দিরের কার্যালয় প্রমুখ ও পরিচালন সমিতির সদস্য জয়ন্ত ঘোষ।

# পরলাকে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা অজিত কুমার চক্রবর্তী

ভাবতীয় রেলে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ কার্যকর্তা অজিত কুমার চক্রবর্তী গত ২১ নভেম্বর দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতলে পরলোকগমন করেন। সকলের

শ্রদ্ধেয় অকৃতদার অজিতদা তাঁর নিলরস, নিঃস্বার্থ এবং সংগঠনের জন্য নিবেদিত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সমস্ত কার্যকর্তার কাছে অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও অন্যতম সংগঠন মন্ত্রী হিসেবে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে সাধারণ সম্পাদক, কার্যকরী সভাপতি ও সভাপতির দায়িত্বও সুচারু রূপে পালন করেছেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে মজদুর সঙ্ঘের শাখা বিভিন্ন ডিভিশনের দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বলিষ্ঠ সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য তিনি দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৪ সালে রেল ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার সময় তিনি কংগ্রেস সরকারের পুলিশের দমনপীড়নের শিকার হন। পুলিশি অত্যাচারের যন্ত্রণা তাঁকে সারাজীবন ভোগ করতে হয়েছে।

পরবর্তীতে তাঁর ওপর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব আসে। শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও দায়িত্ববোধের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব রেল সহ পূর্ব রেলওয়ে এবং কলকাতা মেট্রো রেলওয়েতেও ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। মেট্রো রেলওয়ে কর্মচারী সঙ্ঘ স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযাগ্য ভূমিকা পালন করন।

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

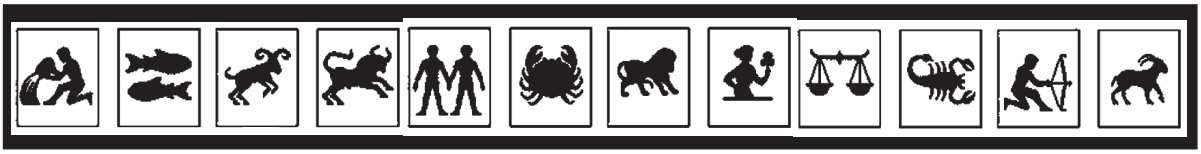

**২৩ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ২৯ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, সিংহে রবি, মঙ্গল, কন্যায় বুধ, শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে রেবতী নক্ষত্র থেকে মিথুনে মৃগশিরা নক্ষত্রে।**

**মেষ :** পারিবারিক সুস্থিতি, চিন্তা চেতনায় দোমনাভাব, অপরিকল্পিত ব্যয়, আলটপকা মন্তব্য বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। রিসার্চ স্কলার, প্রযুক্তিবিদ, সি.এ. প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিদ্যার সঞ্চার— জ্ঞান পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি কর্মপ্রার্থীর প্রতিষ্ঠা, পেশাদারের ক্রমবর্ধমান উন্নতি।

**বৃষ :** কর্মব্যস্ততা, মাতার স্বাস্থ্য ও পারিবারিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, বন্ধুর ব্যবহারে অসংগতি, পরদুঃখকাতরতায় সমালোচনা ও ব্যয়াধিক্য যোগ। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বিদ্যার্থীর সাফল্যের মাপকাঠি। সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতা বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করুন। ক্রয়-বিক্রয় ও নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখা শ্রেয়।

**মিথুন :** সন্তানের জন্য উদ্বেগ, অসুস্থতায় সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব, পরিচিত দ্বারা প্রতারণায় ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিন। কর্মস্থানে সচেতনতা সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা ও ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। গবেষণামূলক কর্মে সাফল্য। স্ত্রীর পরামর্শ বৈষয়িক উন্নতির সহায়ক। সপ্তাহের শেষে হার্ট ও চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা।

**কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা, চাপ, সাফল্য করায়ত্ত হয়ে হাতছাড়া হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন ও বিতর্কিত পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। স্বজন সম্পর্কে উন্নতি সপরিবার ভ্রমণ ও নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ তবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়াধিক্য যোগ। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির আপ্যায়ন, গুরুজনের পরামর্শে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিকট ভ্রমণ।

**সিংহ :** শ্রদ্ধাবান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য জ্ঞান আহরণ, মেধার বিকাশ, বহুমুখী কর্ম প্রয়াস, নীতি নিষ্ঠায় প্রকৃত সম্মান ও স্ত্রী-পুত্র সহ সুখী জীবন। ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে নেতিবাচক ফল। অভিনয়, সংগীত, কাব্য ও কলাজগতের ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা, লোকরঞ্জন, মান্যতা ও প্রশংসা।

**কন্যা :** আর্থিক লেনদেন, লিখিত চুক্তি, চলাফেরা এবং ছিদ্রান্বেষী বিষয়ে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতা, ব্যবসায় ধনলক্ষ্মীর কৃপাবর্ষণ, পেশাদারদের ব্যস্ততা বৃদ্ধি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে রক্তাল্পতাজনিত কষ্ট ও অর্থহানি।

**তুলা :** কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব। গৃহসংস্কার অথবা নব নির্মাণে বিলম্ব। গৃহের পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ। সন্তানের মানসিক অস্থিরতা। আবেগ প্রবণতায় সময়ের সদ্ব্যবহারে অপরাগ। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিমত্তায় দুরূহ কাজে বিজয়ীর সম্মান।

**বৃশ্চিক :** শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত। ঋণবৃদ্ধি বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কর্মপরিকল্পনার সফল রূপায়ণ। পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য ও বিকশিত অন্তর। অগ্রজের উন্নতি, বাধামুক্ত পরিবেশ। রমণীর স্নেহ সুধায় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দময়তার প্রকাশ।

**ধনু :** গৃহ ও মাতৃসুখ, বাড়ি, গাড়ি, বস্ত্র, অলংকার, সুখাদ্য ভোজনে আড়ম্বরপূর্ণতা জ্ঞানার্জন ও কর্মদক্ষতায় স্বীয় প্রতিভায় সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান ও শংসা। কর্মপ্রার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠায় হর্ষোৎফুল্ল চিত্ত তবে সন্তানের বদমেজাজ উদ্বেগের বিষয়।

**মকর :** আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয়, পতি-পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, স্বীয় প্রতিভার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা পবিত্র মনকে কলুষিত করবে। ব্যবসায় জটিলতা, সন্তানের বিধিবহির্ভূত পথে উপার্জনের ইঙ্গিত। রমণী সান্নিধ্যে নিন্দা। সম্মান ও সময়ের অপচয়।

**কুম্ভ :** প্রিয়জন ও প্রতিবেশীর অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যে ব্যথিত। ব্যবসায় বিনিয়োগ, ভ্রমণ ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। কয়লা, পেট্রোল, চর্ম, কাষ্ঠ ও পরিবহণ ব্যবসায় নতুন যোগাযোগে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিশ্রামের পরিসরে আলস্য না আসে, অন্যথায় ভালো সুযোগ ও অর্থনাশের সম্ভাবনা।

**মীন :** দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি তবে স্বীয় আদর্শ, উর্বর চিন্তায় সহজ সরলীকরণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে গুরুজন সান্নিধ্যে হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল, কর্মক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় দক্ষতা ও শংসা। শরীরের মধ্যভাগে আঘাত, অপারেশন এবং হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য